শাহ্‌জাদী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬১

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮ এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণে
রূপা প্রেস
২০৯/এ, বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

সাহিত্যপ্রত্নতাত্ত্বিক

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

॥ পটভূমিকা ॥

দিল্লীর লালকিলাকে প্রাসাদ-দুর্গ বলা হয়ে থাকে। সেকালের অনেক নাটকে দৃশ্যের স্থান হিসেবে ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হত।

তবে এটা কিছু নতুন নয়। তখনকার দিনে—পাঠান সুলতান বা মুঘল বাদশাদের আমলে সব প্রাসাদই তৈরি হত দুর্গের মধ্যে। কারণ, যাদের কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, তাদের সর্বদাই নিরাপত্তার ভয় থাকবে—সে তো স্বাভাবিক।

বর্তমান কালে দুর্গ দিয়ে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো যায় না, তা সে যত সুদৃঢ় দুর্গই হোক। ভরতপুরের দুর্গও ইংরেজদের তোপ সহ্য করতে পারেনি, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ সে আমলে ইংরেজরাও অনেকে বলেছেন ভরতপুর কিলা inpregnable.

তবে এখনকার লালকিলার মধ্যে সে বিপুল প্রাসাদ—গ্রেট মুঘলসদের আমলে বহু সেবক-সেবিকা, স্ত্রী উপপত্নী আত্মীয় পরিজন নিয়ে বাস করতেন বাদশারা, শাহ্জাদা শাহ্জাদীদেরই এক একটি বিপুল পরিবার থাকত বলতে গেলে—সে আবাসস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক ভ্রমণবিলাসীকে বলতে শুনেছি—বর্তমান কিলার খণ্ডাংশ মাত্র দেখে—'ওমা এই লালকিলা! এই যে সব শুনে আসছি ঐশ্বর্য আড়ম্বরের কথা, এর মধ্যে থাকত যারা, তারা আবার কেমন রাজাবাদশা!' এটা যে অসম্ভব তা মাথায় যায় না তাঁদের।

সে বিপুল প্রাসাদের চিহ্ন দেখা যায় না তার কারণ—সে সব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। 'গদরের' পর যখন ইংরেজরা কিলা দখল করেন তখনই ভেঙে দেন কিছু, বা তার আগেই, কামানের গোলায় ভাঙে। প্রাসাদের কিছু অংশ মাটির নিচেও ছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু সে আছে বা বন্ধ করা হয়েছে বা ছিলই না কোনদিন—তা জানা যায় না। একটা নাকি সুড়ঙ্গ পথও ছিল দিল্লী থেকে আগ্রা

প্রাসাদ পর্যন্ত। আতা মসজিদ পর্যন্তও একটা পথ ছিল—সে সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট উক্তি ইতিহাসে নেই।

তবে আগ্রা দুর্গে যে এই রকম নিচের দিকে তিন তলা পর্যন্ত বসবাসের মহল ছিল—তা এখনও দেখা যায়। দিল্লীতেও নিশ্চয় ছিল, নইলে এতগুলো লোক থাকত কি করে! বাদশার ছেলেরা বড় হলে আলাদা থাকতেন, এই নিয়ম সর্বদেশের সর্বকালের রাজবংশেই ছিল। কেবল চতুর্দশ লুইয়ের. ভাই 'মসিয়ে' ভার্সাই প্রাসাদে থাকতেন—এটা কোন কোন বইয়ে পড়েছি।

তবে শাহ্জাদাদের পরিবার ছাড়াও লোক কি কম। সব বাদশারই একাধিক স্ত্রী ও অনেকগুলি করে উপপত্নী বা সেবাদাসী থাকত। তাদের গর্ভেও বাদশাদের সন্তানাদি হত, তারাও কেউ ভালভাবে মানুষ হলে বড় বড় পদ ও পদবী পেতেন। এ নিয়ম আমাদের পৌরাণিক যুগেও ছিল, পাশ্চাত্য দেশে তো ছিলই।

বাদশার কন্যাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন আকবর শাহ্। সেই থেকে সে নিয়ম জাহাঙ্গীর, শাহ্জাহান, পর্যন্ত চালু ছিল। আলমগীর তা ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। এসব বাদশাজাদীদেরও আলাদা মহল থাকত, তাদের ক্রীতদাসী খোজা প্রহরী বা নোকর—তাদের সংখ্যাও কম থাকত না। এইসব মহলও নিরন্ধ্র হত না, উদ্যান প্রভৃতি থাকত, খেলাধুলোর বন্দোবস্তও।

পরবর্তীকালে যখন নিত্য বাদশা বদলাত বলতে গেলে, কেউ দশমাস কেউ বা সাত বছর কেউ বা দুতিনদিন রাজত্ব করেই গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন—স্থানাভাবে সেই পরলোক-প্রেরিত বাদশাহের পত্নীদের আগ্রা ও দিল্লীর মাঝামাঝি একটা স্থানে বর্তমান কালের কলোনি-মতো করে সেইখানে পাঠান হত, মাসিক দশ টাকা ভাতায় —তাকে বলত 'বেওয়া মহল' বা 'সোহাগপুরা'। কিন্তু পুরুষরা—পুত্র পৌত্ররা দিল্লী প্রাসাদেরই 'সালাতীন' নামে একটা অংশে খাওয়াপরার দিন যাপন করতেন। তাদের না হত লেখাপড়া, না হত আদবকায়দার কোন শিক্ষা, তাদেরই মধ্যে থেকে এক একজনকে টেনে

বার করে এনে—পুরনো গুদোম থেকে বার করে ঝুলধুলো ঝেড়ে ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়ার মতই—একটা ভাল পোশাক পরিয়ে তখ্‌তে বসিয়ে দেওয়া হত। সেই জন্যেই শেষের দিকের মুঘল বাদশাদের এই হাল—মদ আর মেয়েমানুষে তাদের দিন কাটত। রাজ্য চালাত মোসাহেবরা। নির্বোধ অপদার্থ অমানুষ—এই এক-একজনের পরিচয়।

কিন্তু সে কথা থাক—আমরা বলতে বসেছি তার আগের যুগের কথা—মুঘল-মহিমা-সূর্য যখন আকাশের সর্বোচ্চ প্রান্তে পৌঁছে সবে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়েছেন, কিন্তু তখনও আসন্ন অস্তগমন সম্ভাবণা সম্বন্ধে অবহিত হননি, সেই সময়কার কথা।

অর্থাৎ আবুল মুজঃফর মুহিউদ্দিন মোহম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলমগীর বাদশা গাজীর আমলের কথা।

তাঁরই অন্তঃপুরের কাহিনী এটা।

তিনি গ্রেট মুঘলস্‌ নামে পরিচিত ছজন বাদশার সর্বশেষ ও সর্বাধিক পরাক্রান্ত—তবু তাঁর সময়েই পূর্ণতার প্রান্ত অতিক্রম করেছে তাঁদের সৌভাগ্যসূর্য।

॥ এক ॥

মহামান্য সম্রাটের কোন পত্র পাওয়া মাত্র তা শিরোধার্য করতে হয়—তা তাঁর স্বহস্তলিখিত বা কেবলমাত্র স্বাক্ষরিত মোহরাঙ্কিত যাই হোক—তারপর সসম্মানে খুলে স্বয়ং শাহানশার পত্র পাওয়া যে পরম সৌভাগ্য ও সুখের কথা—মুখভাবে সেই মনোভাবটি যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলে পত্রবাহক বা বাহিকাকে যথাযোগ্য (যে এনেছে তার পদবীর যোগ্য) বকশিস দিতে হয়—এইটিই শাহী আদবকায়দা। বাদশার আত্মীয়-আত্মীয়া বা অন্তরঙ্গ কর্মচারীদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা এই দরবারী আদব।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের দুহিতা ও সম্রাট আলমগীরের ভগিনী মহামান্যা শাহ্‌জাদী রোশনআরা এ কানুন বা কায়দা জানতেন বৈকি।

প্রায় জন্মাবধিই এ শিক্ষা পেয়েছেন, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও এসব কায়দা-কানুন শিক্ষা দিতে হয়েছে। সোহবতের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে—বিশেষ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের। সাধারণ ভদ্রতা সভ্যতার রীতি ছাড়াও আছে কিছু। এ জাহানের সর্বপ্রধান, সর্বাধিক ঐশ্বর্য- ও পরাক্রমশালী রাজবংশের (তাঁদের বিশ্বাস ও ধারণামতো) কিছু কিছু নিজস্ব আদবকায়দা নিয়মকানুন থাকবে বৈকি। বিরাট শক্তির বৈশিষ্ট্য এটা, তার অস্তিত্বের অঙ্গ বলা চলে।

এসব শিক্ষা—দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে স্বভাবে পরিণত হবার কথা। রোশনআরারও তা নিশ্চয় হয়েছে।

তবু আজ সে সব কানুন ভুলে গিয়ে আদবের খেলাফ্ করে বসলেন।

এ কি হল তাঁর।

পত্রবাহক আলাহ্‌জয়তের বিশ্বস্ত মুন্সী, তাঁর প্রিয় কর্মচারী—তাঁকে অন্তত পঁচিশ আশরফি দেওয়া উচিত ছিল, এক খিলি সুগন্ধী পানের সঙ্গে—সে সব কিছুই মনে পড়ল না। কি আশ্চর্য!

সংবিৎ যখন ফিরল, তখন শাহ্জাদীর নিজেরই বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না।

এ কি করে বসলেন তিনি! এ লোকটি যদি শাহানশার কাছে গিয়ে এ কথা বলে দেন!

আলাহজরত হয়ত এখনি আর এক খৎ পাঠিয়ে জানতে চাইবেন, তাঁর পরম স্নেহের ভগ্নীর যদি অর্থের অভাব হয়েছিল তিনি তাঁর অগ্রজকে জানান নি কেন! তবে কি তাঁর অভিমান হয়েছে প্রিয় ভ্রাতার প্রতি?

এ সবই তো জানেন তিনি। দীর্ঘকাল ধরেই ভাইকে দেখে আসছেন। ভাল করেই চেনেন। চেনেন বলেই তিনি সকলের উপদেশ পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এই ভ্রাতাকে সমর্থন ও সাহায্য করেছিলেন। পরিচিতরা—এমন কি তাঁর সেবিকারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তাঁর আচরণকে একান্ত নির্বুদ্ধিতা ভেবে। এমনকি কেউ কেউ গাম্ভীর্যের ছদ্ম আবরণে আচ্ছাদিত দ্ব্যর্থব্যঞ্জক সতর্ক ভাষায় তাঁকে বিদ্রূপও করেছে। তবু তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। নিজের বিচার-শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল তাঁর। আর সে বিশ্বাস যথার্থ বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

তবে?

আসলে ক্রোধ।

ক্ষণকালের জন্য তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রচণ্ড, বিচার-বিবেচনাহীন, দুর্দমনীয়, অসহ ক্রোধ। এই রকম ক্রোধে অতি বুদ্ধিমানও জ্ঞান হারিয়ে বসে। ক্ষণিকের জন্য উন্মাদ, জ্ঞানহীন হয়ে যায়।

এই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, পরিণাম-চিন্তাহীন ক্রোধের কারণ এ নয় যে জাঁহাপনা তাঁর ভগ্নীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাঁকে এইভাবে একেবারে বাস্তবজ্ঞান-শূন্য করেছে শাহানশার চিঠির ভাষা।

নিজেকে দরবেশ বলে জাহির করেন যিনি সর্বদা—সেই সম্রাটের

কপটতার বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই পত্র। 'শীরিনজবান' মিষ্টভাষী বাদশার পক্ষেই এমন খৎ লেখা ও পাঠানো সম্ভব।

অথচ, এমন কীই বা চেয়েছিলেন রৌশনআরা! এমন কি অপ্রাপ্য বস্তু!

দিল্লীর এই শাহী আবাস সম্রাট শাহ্জাহানের সৃষ্টি-স্বপ্নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই লালকিলা। প্রিয়তমা পত্নীর মকবারা তাঁর স্বপ্ন-কল্পনায় সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—কিন্তু সে কবির স্বপ্ন, লালকিলার পরিকল্পনা সম্রাটের স্বপ্ন।

এ জগতে ভোগ সকলেই চায়, সম্ভব হলে সাধ্য থাকলে তা করেও। একমাত্র হিন্দু ফকির, সুফী সাধক আর মুসলমান দরবেশ ছাড়া। তাদের নাকি ত্যাগ আর কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত! কিন্তু তাও কি সবার? কোন কোন সন্ন্যাসী বা ফকির কি গুরুগিরি করে বিপুল বিত্ত ও অসীম প্রতিপত্তি ভোগ করেন নি? আজমীর শরীফের খাজা বাবা মইনুদ্দীন চিস্তি কি দিল্লীর হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়া—এঁরা কি ওঁদের জগতের এক একজন বাদশা ছিলেন না!

সে কথা থাক। সামান্য দরিদ্র প্রজা থেকে সুলতান বাদশা রাজা সকলেই চায় ভোগ করতে। নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিধিতে যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই ভোগের স্বপ্ন দেখে। এ ভোগের ধারণা সকলের সমান নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীরাই যে শ্রেষ্ঠ ভোগের কথা ভাবেন তার কোন অর্থ নেই। শিক্ষা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি সোহ্‌বৎ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে মানুষকে বলা হয়েছে 'আশরাফুল মখলুকাত' বা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তবু সকলে কি সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখতে পারে! কেউ সম্ভোগ বলতে বোঝে নিত্য নূতন নারীসঙ্গ, কেউ বা নেশাকেই শ্রেষ্ঠ আনন্দ ভাবে। কেউ বা অগণন নরহত্যা করে তৃপ্তি পায়, কেউ বা বহু লোকের ওপর আধিপত্য স্থাপনকেই মানুষের আখেরি লক্ষ্য বলে মনে করে।

কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নরপতি শাহানশাহ্ শাহ্জাহান এসব তুচ্ছ সম্ভোগের স্বপ্ন দেখেন নি কখনও। তিনি নিজে সুরাসক্ত নন। স্ত্রীলোক? হ্যাঁ, নারী সম্ভোগে তাঁর আসক্তি আছে সেটা অনস্বীকার্য। তবে তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি তিনি। ভোগও করেছেন—তবে তাকে কোন প্রাধান্য দেন নি জীবনে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন সর্বদিকেই। তার সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। 'আশরাফুল' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ছাড়া তিনি কখনও কিছু ভাবেন নি। দিল্লীর জামা মসজিদ, লালকিলা, তাজবিবির মকবরা—সর্বত্রই তাঁর পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্যজ্ঞান বা সৌন্দর্যপ্রীতিও। বিরাটের কথা যখন ভেবেছেন তখন সৌকুমার্যর কথা ভুলে যান নি। বিরাট অথচ পুষ্পদণ্ডের মতো ভঙ্গুর, নমনীয়—তাজমহল সেই আশ্চর্য স্থাপত্যের বোধকরি একমাত্র নিদর্শন।

সম্রাট শাহ্জাহান যথার্থ অর্থেই শৌখীন ছিলেন।

পিতৃচরিত্রের এসব দিক, তার বিরাটত্ব তার মহানত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন রোশনআরা। সে সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই। কিন্তু এ পৃথিবীতে বুঝি কেউই, কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নির্দোষ বা নিষ্কলঙ্ক নয়। সম্রাট শাহ্জাহানের চরিত্রেও এইসব অনন্যসাধারণ গুণের সঙ্গে একটি অমার্জনীয় দোষও ছিল (অন্তত তাঁর মতে অমার্জনীয়) সেটা হল পক্ষপাতিত্ব।

তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। পুত্রদের মধ্যে দারা এবং কন্যাদের মধ্যে জাহানআরাই তাঁর সমধিক প্রিয়। অথচ কে না জানে বুদ্ধিতে, দূরদৃষ্টিতে, শৌর্যেবীর্যে আওরঙ্গজেবই তাঁর পুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দারা পণ্ডিত, স্বপ্নবিলাসী, কোমল চরিত্রের লোক, তাকে দিয়ে আর যাই হোক সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না। জাহানআরাও পিতার প্রিয় হওয়ার জন্যই (অন্তত রোশনআরার তাই ধারণা) দারাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। মোরগের লড়াইতে যদি কেউ খঞ্জ মোরগের উপর বাজি ধরে—সে সর্বস্বান্ত হবে বৈকি!

শাহানশাহ্ শাহ্জাহানেরও সেই দুর্দশা হয়েছে। ধাত্সহ নিপুণভাবে নির্মিত অর্ণবপোত ছেড়ে যে সছিদ্র নৌকায় সাগর পাড়ি দিতে যায়—সে তো ডুববেই।

কেউ কেউ রোশনআরাকে বেইমান বলে। পিতৃদ্রোহী হীন ষড়যন্ত্রকারিণী আখ্যা দিয়েছে তারা। কিন্তু তিনি জানেন তিনি বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না। কোন্ নৌকায় দুর্যোগের রাত্রে ভরা নদীতে পাড়ি দেওয়া সম্ভব তা তিনি জানেন। জাহানআরার মতো নির্বোধ তিনি নন, সে কি তাঁর অপরাধ?

পিতাদের বুঝি চিরদিন নির্বোধ অকর্মণ্য সন্তানদের উপরই বেশি স্নেহ জন্মায়। নইলে শাহ্জাহান এমনভাবে দারাকেই যথাসর্বস্ব উজাড় করে দেবেন কেন এবং সর্ব কার্যে সর্ব পরামর্শ-সভায় জাহান-আরাকে সর্বাগ্রগণ্য করবেন কেন।

তবু সাধারণভাবে এই পক্ষপাতিত্বে বিচলিত হতেন না রোশনআরা, কারণ আশৈশব যে অবিচার দেখা যায় তাতে অভ্যস্ত হয়ে আসে মন।

প্রথম বিচলিত হলেন, প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, লালকিলা নির্মাণের সময় যখন বেগম সাহেবা বা জাহানআরার জন্য যমুনার ধারে এক বিশাল প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হল।

মুঘল রাজবংশের চিরদিনের প্রথা হল রাজপুত্ররা কৈশোরকাল প্রাপ্ত হলেই তাদের জন্য পৃথক রাজভবন নির্দিষ্ট হয়—সেইমতো দাসদাসী, সেবিকা ভোগ্যা দুইই—রক্ষক প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। দপ্তরও একটা শুরু হয়ে যায় তখন থেকে। বিবাহ হলে বেগমদের কোন অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থাও থাকে। কিন্তু রাজপুত্রীরা থাকেন সম্রাটদের সঙ্গেই প্রধান প্রাসাদে বা প্রাসাদ দুর্গে। একমাত্র বৃদ্ধবয়সে, তাঁদের অসুবিধা বোধ হলে তবেই ভিন্ন বাসভবনের কথা চিন্তা করা হয়।

কিন্তু জাহানআরা, যেহেতু সম্রাটের প্রিয় কন্যা, ইঙ্গিতে—মাত্র স্বতন্ত্র বাসভবনের ইচ্ছাপ্রকাশ করতেই—হুকুম হয়ে গেল লালকিলা

তৈয়ারির, পূর্বেই বেগমসাহেবার বাড়ি শেষ হওয়া চাই। আর তার জন্য রুমদেশের মহার্ঘ্য শ্বেত ও রঙীন মর্মর, বিলায়তী কাচ আয়না ঝাড় আসবাব—সব সরবরাহ শুরু হয়ে গেল শাহী তোষাখানা থেকে।

তবে এ প্রাসাদে বেশীদিন বাস করতে পারেন নি জাহানআরা। পিতার সঙ্গে তিনি একপ্রকার আগ্রার দুর্গে বন্দী। সে প্রাসাদ খালিই পড়ে আছে। মিথ্যা মিথ্যা দাসদাসীরা বেতন ও আলস্য ভোগ করছে।

সেই কারণেই, বর্তমান সম্রাটের কাছে এই বাসগৃহটির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন রোশনআরা বেগম।

নিতান্তই বিনত সাধারণ মোনাজাত।

অতবড় বাড়িটি তো খালিই পড়ে আছে—সম্রাটের অনুমতি হলে তাঁর এই সামান্যা দাসী সেখানে গিয়ে বাস করতে পারে।

সহজ সাধারণ প্রার্থনা, ভিক্ষার মতোই।

তবে মনে মনে একটু জোর ছিল বৈকি।

বাদশা সালামতের কিছু ঋণ আছে তাঁর এই ভগ্নীর কাছে।

কতকটা জাহানআরার প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ বশতই তিনি আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি কতকগুলি গুপ্তচর বেছে নিয়েছিলেন, পুরুষ ও নারী দুই প্রকারেরই। তাদের বিস্তর অর্থ দিয়ে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বশীভূত করেছিলেন। সে সঙ্গে কিছু ভয়ও দেখিয়েছিলেন—যদি কেউ বেইমানি করে তাকে পরের দিনের আলো আর দেখতে হবে না। যেখানেই যাক আর যেখানেই থাক—শাহ্জাদীর দৃষ্টি ও শক্তির বাইরে যেতে পারবে না। তার জান তো যাবেই, কিভাবে গেল তা জানতে পারবে না কেউ, তার লাশেরও সন্ধান পাবে না।

বুদ্ধিমতী রোশনআরা বেগম মানুষ চিনতেন, কার কিসে দুর্বলতা সেও অজানা ছিল না। অল্প বয়সী তরুণ ছেলেরা—তা সে ক্রীতদাস

কি খোজা প্রহরী যা-ই হোক—তারা অর্থের অত পরোয়া করে না। পরোয়া করে না জান-এরও। অর্থলোভ ও জীবন সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ বাড়ে মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সেক্ষেত্রে তরুণদের জন্য মোহরের সঙ্গে মহব্বৎ বিতরণ করতেও দ্বিধা করতেন না। বলিষ্ঠ জোয়ান ক্রীতদাসকেও আলিঙ্গন দান করতেন হাসিমুখে।

সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারেন নি রোশনআরা। অর্থও এমন কিছু তাঁর ছিল না—তবু অনেকখানিই সাহায্য কি করেন নি তিনি—বর্তমান শাহানশাহকে ?

যাদের জন্যে আজ শাহানশাহ্ তখ্‌ত এ-তাউসে বসতে পেরেছেন তাদের মধ্যে কি রোশনআরা অগ্রগণ্যা নন ?

তিনি এ পক্ষের সমস্ত সংবাদ—সলা পরামর্শ, পরিকল্পনা, এঁদের গোপন মন্ত্রণা, এদের উদ্বেগ, উষ্মা, ক্ষোভ—প্রতিটি তথ্য প্রতিটি মনোভাবের সংবাদ তিনি প্রায় দণ্ডে দণ্ডে পাঠিয়েছেন আওরঙ্গজেবের কাছে।

অনেক সময় দূর দেশে অবস্থিত এই বাদশার কাছে দ্রুত সংবাদ পৌঁছনোর জন্য ঘোড়ার ডাক বসাতে হয়েছে কিন্তু মানুষ থামেনি কোথাও। এতে কি অর্থই কম ব্যয় হয়েছে, না লোকই কম লেগেছে !

এই ব্যবস্থাটা সুপরিকল্পিত সুসংহত সুপরিচালিত করতে অনেক মেহনত করতে হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা গোপন রেখে এইভাবে সংবাদ পাঠানোয় অমানুষিক সতর্কতা প্রয়োজন—চোখ ও কান দুইই সদাসতর্ক রাখা—ধরা পড়লে শুধু এদেরই নয়, তাঁরও প্রাণ যেত। তখনই প্রাণে না মারলেও হয়ত অন্ধ কারাগারে বন্ধ রেখে শরবতের সঙ্গে বিষ [সাধারণত পোস্তর বিষ অর্থাৎ অহিফেন-জাত মৃদু বিষ খাওয়ানো হত এই সব সম্ভ্রান্ত বন্দীদের।] খাইয়ে তিলে তিলে মারা হত।

এ কোন সাধারণ ঝুঁকি নয়···এক রকম জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুমুখী বিপদের সম্ভাবনা।

আর, এ কোন পুরুষের দ্বারা সম্ভব হত না।

অন্তঃপুরবাসিনী নারী বলেই সম্ভব হয়েছে। নারী প্রয়োজন অথচ নারীর মতো দুর্বল কি চঞ্চলমতি হলে চলবে না, তাদের মতো 'পেট-আলগা' হলেও না। পুরুষের বুদ্ধি, পুরুষের সাহস, পুরুষের মতো স্বল্পভাষিতা অবলম্বন করতে হয়েছিল তাঁকে। বহু বহু সংবাদের সঙ্গে বহু কর্ম পরিকল্পনা মনে মনে রাখতে হয়েছে।

এই অমানবিক পরিশ্রমের কি পুরস্কারই বা পেলেন তিনি।

সামান্য কিছু অর্থ—যার ঢের বেশি খরচ করেছেন রোশনআরা —'শোকর গুজারি' অর্থাৎ শুষ্ক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

তবু, নূতন বাদশা তখনও যথেষ্ট বিব্রত, এই বিবেচনাতেই সেই সামান্য ধন্যবাদটুকুই গ্রহণ করেছিলেন।

তবে হ্যাঁ, সিংহাসনে আরোহণের দিন যখন আত্মীয় বান্ধব সভাসদ কবি গায়ক ইত্যাদিদের যে আর্থিক প্রীতি উপহার দেওয়া হয়েছিল তখন তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন রোশনআরাই। পাঁচ লক্ষ সিক্কা টাকা। আওরঙ্গজেব চিরদিনই মিতব্যয়ী। লোকে আড়ালে বলে কৃপণ, তার উপর এতগুলি যুদ্ধে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন—সুতরাং পাঁচ লক্ষ টাকাই তাঁর পক্ষে অনেক এই ভেবেই স্মিত প্রসন্ন মুখে নূতন সম্রাটের জয়ধ্বনি করে তা গ্রহণ করেছিলেন শাহ্‌জাদী।

অবশ্য যে পাওনার দিকটা ভাবে সে প্রাপ্যের হিসাব যতটা খুঁটিয়ে মনে রাখে—যার কাছে এই দাবী, সে ততটা স্মরণ রাখবে তা সম্ভব নয়। এটা রোশনআরাও জানেন। মানবমনের এই সহজ ও প্রধান দিকটা লক্ষ্য না করলে রাজনীতির খেলায় অবতীর্ণ হতে পারতেন না, সাহস করতেন না। সে পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানুষের গুণ ও দুর্বলতার সকল গোপন পথেই তাঁর যাতায়াত আছে। মনের কোন অন্ধি সন্ধিই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

বাদশার এই অভাবনীয় সাফল্যে তাঁর এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং

বুদ্ধির অবদান সামান্য নয়—এটা ভেবে বেশ একটু অহঙ্কারও বোধ করতেন তিনি।

কিন্তু আজ সে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল।

আজ বুঝলেন, আর যে বা যত মানুষের মনের গতিই তিনি বুঝে থাকুন—সম্রাট আলমগীরকে তাঁর চিনতে এখনও কিছু বাকী আছে।

সহজ প্রার্থনা যদি সহজভাবেই প্রত্যাখ্যান করতেন, অন্য কোন কারণ দেখিয়ে—রাজনৈতিক কোন কারণ অনায়াসেই দেখাতে পারতেন তিনি—তাহলে ক্ষুণ্ণ হলেও ক্রুদ্ধ হতেন না—এতটা আঘাত পেতেন না তিনি।

ভগ্নীর প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতই তিনি এই প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারলেন না, বেগমসাহেবার প্রাসাদ শূন্য পড়ে থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়া গেল না—এই কথাতেই তাঁর মাথায় এমন রক্ত চড়ে গেছে।

বাদশা লিখেছেন :—

"রোশনআরা, আমার সর্বাধিক প্রিয় ভগ্নী, আমি তোমার এই সামান্য অনুরোধটুকু আনন্দের সঙ্গেই মঞ্জুর করতুম—কিন্তু তোমার জন্যই তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা গেল না। প্রিয় ভগ্নী, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করি—তোমাকে না দেখলে, তুমি আমার কাছেই আছ এই আশ্বাস মনে বোধ না করলে, আমি থাকতে পারব না। তাছাড়া রাজপুত্রীরা তাদের পিতৃগৃহে থাকবে এ রীতি দীর্ঘকালের। আমার কন্যারাও তোমাকে ছাড়তে চায় না। তুমি তাদের কাছে কাছে থাকলে, তাদের বাদশার অন্তঃপুরের চালচলন, আদবকায়দায় অভ্যস্ত করতে পারবে। এটা তাদের পক্ষে প্রয়োজনও।

"তবে, যদি এখানে তোমার কোন অসুবিধা বা অভাব থাকে তা আমি জানামাত্র পূরণ করব। তুমি কি বেগমসাহেবার থেকে কম আড়ম্বরে বা কম মর্যাদার মধ্যে আছো বলে মনে করো? তা যদি হয় পত্রপাঠ মাত্র তা আমাকে জানাতে দ্বিধা ক'রো না। তুমি তো ভাল করেই জানো এ রাজ্যের মুঘল রাজভাণ্ডারের যা কিছু সম্পদ সবই তোমার।"

॥ দুই ॥

রোশনআরা সম্রাট দুহিতা, সুপ্রাচীন রাজবংশে তাঁর জন্ম। এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর শা দরিদ্র ছিলেন, ভাগ্যতাড়িত ছিলেন, তত্রাচ তিনি রাজবংশেরই সন্তান, নিজ অধিকারে স্বাধীন নৃপতি। বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী আমির তৈমুরের বংশের ষষ্ঠপুরুষ তিনি। তাতার দেশে ফরগনা রাজ্যের শাসক বা মালিক হয়েছিলেন বালক বয়সেই। বালক, অসহায়—কিন্তু সাহস ছিল দুর্জয়, উচ্চাশা ছিল গগনচুম্বী। বার বার রাজ্য জয় করেছেন ও হারিয়েছেন কিন্তু কখনও মনোবল ভাঙেনি তাঁর। শেষ পর্যন্ত এই হিন্দুস্তান এসে এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেছেন।

রোশনআরা তৈমুর থেকে একাদশ পুরুষ—বাবুর শাহ্ থেকে ষষ্ঠ। রাজবংশে দিগ্বিজয়ীর বংশে জন্ম তাঁর—মনোভাব গোপন করার, হতাশা বা আনন্দ কোনটাই মুখে না প্রকাশ পায়, এই অভ্যাসের শিক্ষা—বংশ-পরম্পরায় রক্তস্রোতে পেয়েছেন তাঁরা।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন ক্রোধে উন্মত্ত হওয়া এই প্রথম। কিছুকাল কোন জ্ঞান, কোন হিসাববোধই ছিল না। তবে সে অবস্থা দমন করতেও বিলম্ব হল না।

আবারও ফিরে এল বাহ্যিক প্রশান্তি। মুখে সৌভাগ্যের দীপ্তিও ফুটে উঠল, যেন বাদশা তাঁর অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করেছেন।

তিনি তখনই তাঁর এক পুরাতন সেবক—খোজাপ্রহরীকে ডেকে রজতপাত্র করে রেশমী রুমালে আবৃত পুরো একশোটি আশরফিই পাঠালেন শাহানশার খাস মুন্সীর কাছে।

সেই সঙ্গে এ বার্তাও পাঠালেন যে, এতদিন পরে তাঁর ভাইজানের স্বহস্তে লেখা খৎ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন বলেই আদবের খেলাফ হয়ে গেছে। খাস মুন্সী সাহেব যেন কিছু মনে না করেন।

অবশ্য মুখভাবের সঙ্গে মনোভাবেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এটা বিদ্বজ্জনের প্রধান শিক্ষা। বাদশার কন্যারা প্রায় সকলেই বিদুষী, বর্তমান বাদশার জ্যেষ্ঠা কন্যা তো রীতিমতো দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নিজে একজন কবিও। সেই ভাবেই তাঁদের লেখাপড়া শেখানো হয়, এলেমদার, বলে গণ্য হন তারা।

রৌশনআরাও এই ভাবেই শিক্ষিত হয়েছেন। অবুঝ মনোভাবকে কঠিন শাসনে দমন করে চিত্তকে বিচারে ও বিবেচনায় ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হয় নি।

তিনি নির্বোধ নন, তবে শাহানশাহ যে তাঁর অপেক্ষা অনেক বেশি বুদ্ধিমান এটা তিনি মানতে বাধ্য।

কেন তিনি কিলার বাইরে স্নেহের ভগ্নীকে রাখতে চান না, সে কারণ রৌশনআরা নিজেই জানেন। এবং প্রার্থনা নামঞ্জুর করায় কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে কারণ যে উল্লেখ করা যায় না, এ তিনি বোঝেন; অন্তত এখন উষ্মা প্রশমিত হলে বুঝছেন।

না, এতটা ক্রুদ্ধ হওয়া ঠিক হয় নি। এতে তাঁর নিজেরই শরীরের ক্ষতি। এই ভাইকে কেউ দমাতে পারবে না কোনদিনই। এঁর বিরোধিতা করতে যাওয়া ঘোর মূর্খতা। বরং অনুগত থাকলে ভবিষ্যতে অনেক রকমের সুবিধা আদায় করা যাবে।

তাঁর ফয়েজ বা সহায়তার কথা বাদশার অন্দরে ও অন্তরঙ্গ সমাজে অনেকেই জানেন। তিনি যে বাদশার বিশেষ প্রিয়পাত্রী তাও কারও জানতে বাকি নেই। সেজন্য অনেক প্রতাপ প্রতিপত্তি ভোগ করেন তিনি। সে সুবিধা নষ্ট করে লাভ নেই।

তবে কারণ যা, বর্তমান বাদশা ছাড়া কেউ তাকে আজকাল অপরাধ বা গোনাহ্ বলে মনে করে না।

আকবর বাদশা নিজের কন্যাদের বিবাহ দেবার মতো উপযুক্ত পাত্র খুঁজে না পেয়ে এক ফতোয়া জারী করেছিলেন যে সম্রাট-দুহিতারা বিবাহ করবে না। আদর্শ স্বরূপ মিশর রুম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের রাজকীয় নিয়মের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

বিবাহ না দিলে রাজপুত্রীদের বিবাহ করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তবে, তাঁরা বাদশার আদেশ মানলেও দেহগুলো তা মানবে কেন?

যৌবনকাল পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলের দেহেই এক উগ্র ক্ষুধা জাগায়। তাতে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মানুষ থেকে অনায়াসে পশুর স্তরে নেমে আসে। হারেমের বন্দিনী এই সব সম্রাট-দুহিতারাও যদি উগ্র যৌবনতৃষ্ণা নিবারণের জন্যে গোপন পথ অবলম্বন করে— এমন কি অসহ্য তৃষ্ণার জ্বালায় দুর্গন্ধময় অপেয় জল অঞ্জলি ভরে পান করে—তবে তাদের কি খুব দোষ দেওয়া যায়। এ দেহ, তার ধর্ম সবই কি জগদীশ্বরের সৃষ্টি নয়?

এইভাবেই এ বংশে তৃষ্ণা নিবারিত হচ্ছে। কখনও যদি সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজপুরুষ ভাগ্যে জোটে তো তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন— কিন্তু কখনও কখনও বালক ক্রীতদাস বা নিম্নস্তরের সেবক দিয়েও পিপাসা মেটাতে হয়।

লোকে বলে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জাহানআরা পবিত্র, এ ধরনের চরিত্রদোষ শূন্য। হবেও বা। তিনি নিজে অবশ্য তেমন দোষের কোন প্রমাণ পান নি—তবে বিশ্বাস করাও কঠিন। সত্য হলে বলতে হবে বেগমসাহেবার দেহ রক্তমাংসে প্রস্তুত নয়—পাথরে তৈরি। ভগ্নী গৌহরআরার সাহস কম, তবে তিনি যে সুদর্শন বালক সেবকদের মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করেন তা কে না জানে। এই বাদশারই কন্যা কবি ও পণ্ডিত জেবউন্নিসা কি প্রকাশ্যেই আকিল খাঁকে নিজের শয়নগৃহে আহ্বান করেন না?

সকলেই এ পথের পথিক; তবে হ্যাঁ, রোশনআরার সম্ভোগ তৃষা হয়ত একটু বেশি।

তা স্বীকার করেন রোশনআরা।

নানা পুরুষ তাঁকে উচ্ছিষ্ট করেছে। অথবা তিনি বহু পুরুষকে উচ্ছিষ্ট করেছেন। আত্মীয় থেকে শুরু করে তরুণ সেনানায়ক পর্যন্ত। ইদানীং যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে তাঁর অল্পবয়সী কিশোর বা তরুণদের দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশি।

এর জন্য তাঁকে অজস্র অর্থব্যয়ও করতে হয়।

উপযুক্ত সম্ভোগ-পাত্র নির্বাচন, তাদের গোপনে শাহী-কিলার অন্তঃপুরে নিয়ে আসা আবার নিরাপদে বাইরে পৌঁছে দেওয়া, এ কাজে অজস্র বিশ্বস্ত লোক লাগে। খোজা প্রহরী এবং তাতারী প্রহরিণীদের দৃষ্টি শকুনের মতোই। কোথায় কিঞ্চিৎ উপরি পাওনার সুযোগ আসছে, আসতে পারে—সে সম্বন্ধে সদা সচেতন তারা। তাঁর নিজের দাসী এমন কি ক্রীতদাসীরা পর্যন্ত পর্যাপ্ত টাকা না পেলে এত ঝুঁকি নিতে চায় না। অল্প টাকাতে তাদের দিয়ে যদি বা কাজ করানো যায়, তথ্যটা গোপন রাখবে কি না সন্দেহ। সেজন্যেই প্রচুর ঘুষ দিতে হয়।

আর এই জন্যেই পৃথক প্রাসাদের জন্যে এত আকিঞ্চন শাহ্জাদীর। সেখানে এত টাকা খরচ, এত ভয়ে ভয়ে থাকার কোন কারণ থাকে না। আর ঠিক সেই কারণেই, বাদশাসালামৎ তাঁকে চোখের বাইরে পাঠাতে চান না।

ভগ্নীর পুরুষ-সংক্রান্ত এ দুর্বলতা তিনি জানেন, দীর্ঘকাল ধরেই এ সম্বন্ধে অবহিত তিনি। বোধ করি এ প্রাসাদের, প্রাসাদ কেন —সমগ্র সাম্রাজ্যেরই কোন তথ্য তাঁর অজ্ঞাত থাকে না। তাঁর রাজ্য পরিচালনার সব থেকে বেশী খরচ নাকি গুপ্তচরদের জন্যেই হয়। অনেক সময় বাপের কাজ বা কথার খবর ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন তিনি—কিছু টাকা দিয়ে।

তিনি জানেন দীর্ঘকাল যাবৎই, তবে এ দুর্বলতাকে দমন করাও কঠিন—এও তাঁর অজানা নয়। সম্রাট মদ খান না, নেশা করেন না, বিলাসে বীতরাগ তাঁর—তবু, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুর্বলতা কি তাঁরই কম। কিভাবে পিতার ওপর জুলুম ক'রে দারার ক্রীতদাসীটাকে নিজের ঘরে আনলেন তিনি—এ ইতিহাস সকলেই জানে, এ পরিবারের বা এ কিলার অধিবাসীদের।

তাঁর অনীহা, এ সংবাদ প্রচারিত হওয়াতেই।

প্রাসাদের মধ্যে সম্রাটের কাছে থাকলে সতর্ক থাকতেই হয়,

স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকলে তাঁর এইসব কুকীর্তি কারও জানতে বাকি থাকবে না, বাজারে হাটে সর্বত্র জনসাধারণের 'মজাদার কেচ্ছা' আলোচনায় খোরাক যোগাবে।

স্বাধীনতা পেলে ওঁর এই লাম্পট্যও বাড়বে—তা রৌশনআরা নিজেও জানেন। জেনেশুনেই করবেন তিনি ; সংযত হবেন, সতর্ক হবেন—এ তাঁর দ্বারা হবে না। তাঁর নিজের ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই।

বিশেষ এই কিছুদিন আগের ঘটনাতেই সম্রাট আরও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তবে এ বিরক্তি ভগ্নীর ওপর তত নয় যতটা খোজা পেয়ার আলির ওপর।

বোধ হয় উপযুক্ত পারিতোষিক দেওয়াতে কিছু কার্পণ্য ক'রে থাকবেন রৌশনআরা বেগম—সাধারণ খোজা প্রহরীরা তাদের ওপরওলা পেয়ার আলিকে খবর দেয় যে মহামান্যা বেগম সাহেবার মহলে মধ্যে মধ্যে বাইরের কিছু কিছু ছোকরা আসে। তারা অনেক সময় রাত কাটিয়ে ভোরে চলে যায়—কখনও বা দু-তিন দিনও থাকে। এদের নতুন পোশাক, দামী পাথরের আংটি প্রভৃতিও দেওয়া হয়ে থাকে।

পেয়ার আলি সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল।

বাদশার অধিক 'পিয়ার' লাভের এ সুযোগ কি ছাড়া যায়। এ খাদেম যে কত হুঁশিয়ার, কত সজাগ বাদশার সেবায়, তা প্রমাণ ক'রে দেবে সে।

পেয়ার আলির তাঁবে যত নৌকর ও পাহারাদার সকলকে নিয়ে সে সেই দিনই শেষ রাত্রে বাদশাজাদীর মহলের চারিদিকে জাল পাতার মতো পাহারা বসাল।

ধরা পড়লও দুটি অতিশয় সুদর্শন তরুণ ছেলে, ভোর রাত্রে অন্য দিনের মতো বাগানের পথে বাইরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে।

তাদের গ্রেপ্তার ক'রে রেখে বুক ফুলিয়ে বাদশার কাছে এত্তেলা পাঠাল পেয়ার আলি—তাঁর খাস নৌকর মারফৎ—শাহজাদী

হজরৎ-বেগম সাহেবার মহলে দুটি ছোকরা ঢুকেছিল, তাঁর খাদেম তাদের ধরেছে, এখন তাদের কি শাস্তি দেওয়া হবে ?

বাদশা-সালামতের মুখ যে অন্ধকার ও ভ্রূকুটিবদ্ধ হয়ে উঠল, পেয়ার আলির দুর্ভাগ্যবশত সে দেখতে পেল না।

কার্যকারণ সবই তো তাঁর জানা। এ নির্বোধগুলোর যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত তাহলে ছেলেদুটোকে ধরত না।

কিন্তু কি আর করা যাবে এখন। বাদশা সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'যে পথ দিয়ে ওরা শাহ্জাদীর মহলে ঢুকে ছিল সেই পথ দিয়েই বার ক'রে দাও।'

পেয়ার আলির অনেকখানিই আশাভঙ্গ হল। এই বেত্তমীজ দুটোকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে নির্যাতন করতে পারলে তার হিম্মত প্রচারিত হত অনেকটা।

বাদশা এমন অপরাধীদের এমনিভাবে বেকসুর খালাস দিলেন। কী হচ্ছে দিন দিন জাঁহাপনার, এত কোমল-হৃদয় তো উনি ছিলেন না।

আসলে অনেকদিন কোন অপরাধীকে নির্যাতন করে মারা হয়নি। ধরো মাটিতে অপরাধীর দেহের অর্ধেকটা পুঁতে কতকগুলো ক্ষুধার্ত মাংসভুক কুকুর ছেড়ে দিয়ে তাকে মারা ; অথবা দেহটা চিরে চিরে দিয়ে তাতে নুন ছিটিয়ে দেওয়া—কিম্বা 'মিরচার' গুঁড়ো ; শূলে চড়িয়ে রেখে আসা—সেইভাবে থেকে যে কদিনে মরে ; ইত্যাদি। এর চেয়েও আছে, মাটির নিচের কারাগারে বিবিধ বিচিত্র রকমের দৈহিক কষ্ট দেবার সরঞ্জাম। কিন্তু অতদূর যাওয়ার পথ নেই পিয়ার আলির, শুধু অনেকদিন একেবারে 'নিরামিষ' দিন কাটছে বলতে গেলে, আলা হজরতের কঠিন শাসনের ভয়ে কেউ বিশেষ আজকাল তেমন কোন অনাচার করে না—মানে, অন্তত ওর চৌহদ্দীতে—এতকাল পরে যদি বা একটা সুযোগ পাওয়া গেল, জাঁহাপনা একেবারে করুণাবতার হয়ে গেলেন।

খয়ের। এখনও তো ওর হাতেই আছে ছোকরা দুটো—দেখা যাক না কতদূর কি হয়।

ছুজনকেই জিজ্ঞাসা করা হল (বাদশার আদেশ একেবারে অগ্রাহ্য করার সাহস নেই কারও) 'কোন পথ দিয়ে এসেছ তোমরা ?'

একজন বললে মহলের দরজা দিয়ে।

তাকে সেই পথেই—যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্বেও—যেতে বলা হল। বাকি ছেলেটা বোকা, সে বলে ফেলল, 'পাঁচিল টপকে ঢুকেছি।'

পিয়ার আলির চোখ জ্বলে উঠল। হুকুম দিল 'ওকে ঐ পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ওপারে ফেলে দেওয়া হোক।'

তাই দেওয়া হল। হাড়গোড় ভাঙল কিন্তু তখনই তো কেউ মরে না তাতে—পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, ভিড় হয়ে গেল দেখতে দেখতে। নানা প্রশ্ন—মুখরোচক সরস কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে সকলেই উৎসুক পুরো ঘটনা জানতে—যদিচ ছেলেটার বেশী কিছু বলার মতো শক্তি ছিল না তখন—তবু কিছু তো জানা গেল। ছু একটা শব্দ থেকেই অনেক কিছু জানা যায়—বাকিটা মনের কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নেওয়ায় কোন অসুবিধা নেই, 'কিছু বা পাই অনুমানে।'

সুতরাং হাসাহাসি, চোখ টেপাটেপি, এসব তো হবেই।

কালক্রমে নয়—সেইদিনই কথাটা শাহানশার কানে পৌঁছল—এমনি দ্রুত সংবাদ পাওয়ার ব্যবস্থাই তাঁর শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ—তাঁর ছুই আপাত-অবিচলিত দৃষ্টিতে অগ্নি জ্বলল না, শুধু তা কঠোর ও কঠিন ইস্পাত-অস্ত্রের মতো শাণিত হয়ে উঠল।

পিয়ার আলি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে অকারণে ছুর্ব্যবহার করে এই অপরাধে তাকে সেইদিনই শাহী জঙ্গল মহলের 'শিকার কুঠি'তে অর্থাৎ বাদশা ও শাহ্জাদারা শিকার করতে গেলে যেখানে থাকেন সেখানে বদলি করা হল।

সেই জন্যেই শাহানশার ভগ্নীর প্রতি এত স্নেহ যে তাঁকে চোখের আড়ালে রাখতে চান না।

এত স্নেহের আসল কারণ রোশনআরা সাহেবার এই সামান্য প্রমোদেচ্ছা।

এ সত্য মহা-ধুরন্ধর দূরদৃষ্টি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সদাজাগ্রত অগ্রজের উপযুক্ত ভগ্নীর না বোঝার কথা নয়।

তবে, তিনিও রৌশনআরা—পুরুষের মতোই এই সত্ত্ববিগত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে অন্যতম প্রধান অংশ নিয়েছিলেন তিনি এবং সগৌরবেই সে দায়িত্ব পালন করেছেন—এর উত্তর তিনি অগ্রজকে ভালো ভাবেই দেবেন। যে রাজকার্যে অগ্রগণ্য সে সম্ভোগেই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

একবার ধরা পড়ে গেছেন বলে চিরদিন ধরা পড়বেন না। এতদিন বৃথাই গুপ্তচর-চক্রের প্রধানা হিসেবে কাজ করেন নি!

॥ তিন ॥

সম্রাট আলমগীরের প্রিয় কন্যা শাহ্জাদী জিনৎউন্নিসা [ইতালিয়ান ঐতিহাসিক 'মানুচী' এঁকে ফক্রউন্নিসা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আচার্য যতুনাথ সরকারের তালিকায় এরকম কোন নাম নেই—আছে জিনৎউন্নিসা। এ গ্রন্থের 'কিস্‌সা' অংশ যদিচ মানুচীর বিবরণ থেকেই গৃহীত—নামের ব্যাপারে যতুনাথই অধিক নির্ভরযোগ্য বলে বোধ হয়।] সেদিন খুব ভোরে তাঁর শয্যা ত্যাগ ক'রে বাগানে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সাধারণত তিনি প্রভাতের প্রথম ভাগেই শয্যা ত্যাগ করেন। যে সব কারণে এখানের অধিবাসীরা প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হলে বা দ্বিতীয় প্রহরের প্রায় অবসান কালে সুখসুষুপ্তি ত্যাগ করেন—তার কোনটাই জিনৎউন্নিসার নেই। তিনি মদ্যপান বা অন্য কোন নেশা করেন না; বিবাহও করেন নি যে রাত্রিজাগরণের প্রশ্ন উঠবে। রাত্রিকাল যাঁরা উপভোগ করেন তাঁদের প্রভাত দর্শনের আনন্দ ত্যাগ করতে হবে বৈকি।

তবে জিনৎউন্নিসার মতো এত শেষ রাত্রে বলতে গেলে রাজ পরিবারের কেউ সজাগ হন না—এক স্বয়ং বাদশা ছাড়া। এঁর পিতামহ দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত না হলে পৃথিবী বা সংসার সম্বন্ধে অবহিত হতেন না, কারণ তাঁর অতিরিক্ত সুরাসক্তি। পিতা সম্রাট শাহ্জাহানের সুরা সম্বন্ধে এত দুর্বলতা না থাকলেও নারীসঙ্গলিপ্সা ছিল প্রবল—তবু তিনি তাঁর পিতার মতো তৃতীয় প্রহরে সচেতন হতেন না, প্রথম প্রহরেই তাঁর স্নান নামাজ দরবারী বেশ প্রভৃতি সারা হয়ে যেত—প্রতিদিন ঠিক নটায় দেওয়ান-ই-আমে গিয়ে প্রজা সাধারণকে দর্শন দিতেন।

জিনৎউন্নিসার এত ভোরে ওঠার কারণ, কিছু দিন ধরেই তাঁর রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না। হেকিমী দাওয়াই ছাড়া আর যা করবার

সবই করেছেন—চন্দনের শরবৎ খেয়ে রাত্রে শুয়ে দেখেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি একদিনও।

সাধারণ লোকে মনে করে যারা ধনী, প্রচুর অর্থ ও সামর্থ্য যাদের আছে—এ পৃথিবীর তাবৎ সুখই তাদের করায়ত্ত—তাদের কোন দুঃখ বা অতৃপ্তি থাকতে পারে না।

'দুগ্ধ-ফেননিভ' শুভ্র সুন্দর, পক্ষীপুপর্ণে প্রস্তুত কোমল শয্যায় যে শয়ন করতে পারে—তার কি কখনও নিদ্রার অভাব হয়?

কিন্তু বিত্তশালী ধনকুবের, বিশেষ রাজা-বাদশাদের ধারণা অন্য-রকম। কোমল শয্যা তাঁদের অনেকের কাছেই কণ্টকশয্যা। তবুও আমরা—সাধারণ গরিব মধ্যবিত্ত লোকেরা মনে করি যে রাজা বা রাজনীতিক শাসকদের দায়িত্ব অনেক বেশি, উচ্চাশা পর্বতপ্রমাণ, পদবীভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অহরহ—সুতরাং তাঁদের মনে শান্তি না থাকতে পারে, তবে স্নেহে ও ভোগের মধ্যে লালিত তাঁদের পুত্র-কন্যাদের তেমন কোন দায়িত্বও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই, তারা সুখেই থাকে।

সেখানেও আমরা ভুল করি। নিয়মরীতি আদব-কায়দার শৃঙ্খলে বাঁধা রাজপুত্র রাজপুত্রীদেরও জীবন সব সময় সুখে কাটে না। তাদেরও উচ্চাশা থাকতে পারে, ষড়যন্ত্রের বিষ তাদের মনকেও পঙ্গু, সুখভোগ-অক্ষম করে তুলতে পারে। এগুলো ঐশ্বর্য নামক ফুলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—দুঃখের কাঁটা।

তবে জিনৎউন্নিসার ঘুম না হওয়ার এমন কোন কারণ নেই। উনি বিবাহ করেন নি ইচ্ছা ক'রেই। ওঁর আর দুটি বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় জেবুন্নিসার বিয়ে হয় নি তারও কারণ তাঁর অনিচ্ছা। তিনি কবি, পণ্ডিত, সেই দিকেই তাঁর ঝোঁক। জিনৎউন্নিসার সেদিকেও যেমন ঝোঁক নেই, তেমনি বিয়েরও তত ইচ্ছা নেই। কার ঘরে গিয়ে পড়বেন, সে মানুষ কেমন হবে—হয়ত জীবনে সুখ শান্তি কিছুই থাকবে না—এই তাঁর ভয়। তার চেয়ে এই বেশ আছেন—এই ছিল তাঁর মনোভাব।

কিন্তু ইদানীং এই 'বেশ থাকাতেই' কিছু ব্যাঘাত ঘটছে।

কি জানি কেন তাঁর মনে একটা ঘোর অতৃপ্তির ভাব দেখা দিয়েছে। কি যেন নেই, কি যেন পাচ্ছেন না। জীবনে কি একটা বড় রকমের শূন্যতা।

কিছুদিন ধরে এই ভাবটা আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে।

তাঁর এক দাসী আছে—যে নখ কাটে, নখে মেহেদী রঙ লাগিয়ে দেয়, দুই পায়ের ওপর রঙের পত্রলেখা রচনা করে—সে ঠিক ক্রীতদাসী নয়, তার গুণপনার জন্যই তাকে ডেকে এই কাজ দেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে তাকে তিন চার দিন ছুটিও দেওয়া হয়—স্বামী-ছেলে-মেয়েদের দেখে আসার জন্যে।

সেই দাসীটিই বলতে গেলে বাহির-বিশ্বের দিকের বাতায়ন এঁদের। ওর মুখ থেকে এঁরা সাধারণ জীবনযাত্রার অনেক খবর পান। জনসাধারণ কীভাবে জীবন কাটায়—তাদের সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ অভাব অভিযোগ।

এমন দাসী আরও অনেক আছে।

এরা হারেম বা অন্দর মহলের ভারপ্রাপ্ত পাহারাদার বিশ্বাসী ও ভয়ঙ্কর খোজাদের চোখে থাকে—সুতরাং বেইমানি করার কি চুরি-চামারি করার সুযোগ পায় না। তাই বলে যে এসব একেবারে হয় না তাও না, যে সব দাসীরা খোজা গরিব নেওয়াজ মন যুগিয়ে চলতে পারে—দেহ বা অর্থ দিয়ে তুষ্ট করে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না।

এই দাসীটি গুলরস, মধ্যবয়সী—তার চেয়েও বড় কথা নিপুণ প্রসাধনশিল্পী বলে শাহ্জাদীদের প্রিয়পাত্র। জিনৎউন্নিসার কাছে বড় কথা—অন্য দাসীরাও বাইরের বার্তা আনে কিন্তু তারা এত ভাল বলতে জানে না। গুলরস বলতে জানে। তার ভাষায়, চোখ মুখের ভঙ্গীতে যেন কথ্য ঘটনাগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। শাহ্জাদীরা চোখের ওপর সে ঘটনা সব প্রত্যক্ষ করেন প্রায়।

গুলরস শ্রোত্রীও চেনে। কার কাছে কোন ধরনের কিস্‌সা আদৃত হবে তা জানে সে।

তাই জিনৎউন্নিসার কাছে তাদের ও তাদের আত্মীয় স্বজনের ঘরকন্নার গল্পই করে—বিশেষ করে কুমারী বয়স্কা শাহ্জাদীর রোচক হবে বুঝেই—প্রণয়ের কথাই বেশি।

তার মুখেই প্রথম শুনলেন শাহ্জাদী যে রাজপুত্রীরা, বাদশার ঘরের লেড়কিরা দাম্পত্য সুখ কাকে বলে তা জানে না। তাদের বিয়ে হয় সমান ঘরের ছেলের সঙ্গেই—এই যে শাহানশাহ্ ছেলেদের বিয়ে দিলেন আপন ভাইঝিদের সঙ্গে, মেয়েদের দিলেন তেমনি ভাইপোদের হাতে। এমন কি পৌত্র সম্পর্কীয় পাত্রর হাতেও কন্যা বা ভ্রাতুষ্পুত্রীদের দিতে দ্বিধা করেন নি—কারণ তারা ওঁর আপন রক্তের আত্মীয়, সম্রাট বংশের ছেলে।

এইসব শাহ্জাদা এমন কি উজীর, বড় বড় মনসবদার, প্রাক্তন পাঠান রাজবংশের সন্তান উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এরা সকলেই ধর্মের অনুমোদন মতো চারটি করে শাদী করেন, উপপত্নী ক্রীতদাসী থাকে অজস্র। এঁদের স্ত্রী সম্ভোগ শুরু হয়ে যায় পনের বছর বয়স থেকে। শাহ্জাদীরা যখন তাঁদের অঙ্কগত হন তখন তাদের সে উগ্র ক্ষুধা অনেকটাই মিটে যায়। অনেকের দেহে ও মনে ক্লান্তিও দেখা দেয়। এই বধূ বা প্রধানা বেগমরা (বংশগত পদবী হিসাবে) হয়ত পুরুষদের স্বাদ পান, গর্ভে সন্তানও ধারণ করেন—কিন্তু পুরুষের একাগ্র উগ্র প্রেম কাকে বলে তা বুঝতে কি জানতে পারেন না।

তার নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। তার প্রতিবেশীদের কথা, তার আত্মীয়ের কথা।

প্রথম যখন সে শ্বশুরঘর করতে আসে—যৌবন লক্ষণ দেখা দেবার পর—তার মরদ যখন তাকে বুকে চেপে ধরত, না, শুধু রাত্রে বিছানায় শুয়ে নয়, দিনে দুপুরে সকালে—যখন তখন—ওর মনে হত বুঝি দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকের পাঁজর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে—তবুও ভাল লাগত। মনে হত এই নিবিড় নিশ্ছিদ্র আলিঙ্গনে পিষ্ট হয়ে মরেও সুখ। আর এ কি একবার আধবার। মাঠে

চাষ করতে গেছে, গুলরসকে হয়ত 'শাস' পাঠালেন নাস্তাপানি দিয়ে আসতে, কি দুপুরের রুটি—ব্যস, কোনদিকে খেয়াল নেই মরদের—কে দেখছে চেয়ে দূরের মাঠ থেকে, ভাশুরও হয়ত থাকতে পারে—হাতের রুটির পুঁটলি আর জলের বদনা কোনমতে একদিকে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে অমনি জড়িয়ে চেপে ধরবে, কোন দিন বা বুকে তুলে নিয়ে লোফালুফি করবে খেলার পুতুলের মতো। তাতেই কি নিস্তার আছে—তারপর কোন কথা না বলে টেনে নিয়ে যাবে কোন ঠেঁঠির কাঁটাঝোপের দিকে—ঐ একটু আড়াল-মতো জায়গায়। মরদের ক্ষিধে যেন মিটত না, দিনে রাতে সব সময়েই সে তৈরি।

সে এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটত। আজও মনে হলে গুলরসের বুকের মধ্যে যেন কিসের একটা উত্তাল ঢেউ ওঠে। হাত-পা কাঁপতে থাকে সে সুখের কথা ভেবে। সে আনন্দের স্মৃতিতে যেন পাগল হয়ে ওঠে এক এক সময়। খেতে পেত কি পেত না, পেলেও হয়ত অর্ধেক দিন শুধু পোড়া রুটি ছাড়া কিছু জুটত না—কিন্তু সে কথা তো কই একবারও মনে পড়ে না।

এমনি আরও অনেক কথা বলে যায় গুলরস বিবি। আরও অনেকের কথা।

এক নানী ছিল তার, সে বুড়ির কথা শুনেছে গুলরস খালার কাছ থেকে। সম্পর্কে মাসি হলেও সে গুলরসের প্রায় সমবয়সী। নানার নাকি অদ্ভুত একটা রোগ ছিল—বৌকে বেদম না পেটাতে পারলে তার শরীর তাতত না। তবে যখন তেতে উঠত মরদটা, তখন একেবারে দানোর বাচ্ছা—এমন শক্তি। নানী নাকি তাই যখন তখন সেধে যেত মরদের কাছে মারখাবার জন্যে। সর্বাঙ্গে কালসিটে পড়ে যেত, নাক মুখ ফুলে উঠত, তবু সে ইচ্ছে করেই যেত মার খেতে। সেই মরদ যখন মাটিতে গেল বুড়ি সাত দিন মুখে রুটি-পানি দেয় নি।

যাকে সামনে পেত কাঁদতে কাঁদতে বলত, তার মরদ তাকে একদিনের জন্যেও কোন দুঃখ দেয়নি, কোন শক্ত কাজ করতে দিত না—বৌয়ের নরম শরীরে লাগবে বলে। ভিন গাঁয়ে যেতে হলে যত ক্রোশ পথই হোক—গাঁয়ের বাইরে গিয়েই পিঠে চাপিয়ে নিত, সেইভাবে হেঁটে যেত, আবার কুটুমবাড়ির কাছে গিয়ে নামিয়ে দিত। মরদ নাকি বলত যে অমনি করে গলা জড়িয়ে পিঠে বুক দিয়ে বসলে সে হাজার ক্রোশ বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব।

জিনতের বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা হা-হা করে বেড়ায়।

এক এক সময় শেজ-এর নরম আলোয় চারিদিকের মহার্ঘ সজ্জার দিকে চেয়ে মনে হয় তারা যেন ওঁকে বিদ্রূপ করছে। ওঁর এই ঘুম না আসা যে ওঁরই বোকামির ফল নীরবে তাই শোনাতে চাইছে। বিছানার পাশে রাখা ফুলগুলোর সে ব্যঙ্গের ধিক্কারের শব্দও তিনি যেন শুনতে পান।

এক এক সময় মনে হয় সত্যিই যদি কোন খেটে খাওয়া শক্ত জোয়ান মরদ ওঁকে সজোরে চেপে ধরত বুকের মধ্যে—যাতে হাড়সুদ্ধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয়—তাহলে মনে শান্তি আসত, সান্ত্বনা লাভ করতেন। এখনও ভাবেন এক এক সময় কোন পুরুষ যে তাঁকে সত্যি সত্যিই ভাল বাসবে—রাজকন্যা বলে নয়, অনেক লক্ষ টাকা যৌতুক পাবে বলে নয়—সে যদি ওঁকে লাথিও মারে তাতেও সেটায় উনি আনন্দ পেতেন।

পরক্ষণেই নিজের পাগলামিতে চমকে ওঠেন। সত্যিই কি পাগল হয়ে যাবেন নাকি?

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বাপজানকে বলবেন বিবাহের ব্যবস্থা করতে? না, কোন শাহজাদা নয়, সাধারণ কোন ভদ্রলোক, বড় জোর যুদ্ধ-ব্যবসায়ী কোন সিপাহসলারের সঙ্গে।

কিন্তু বাদশা কি তাতে রাজী হবেন।

হওয়া বুঝি সম্ভবও নয়। ওরই আশা করা অন্যায়।
শাহ্জাদী হয়ে জন্মানোর অনেক দায়, অনেক বন্ধন।

বাগানে এসে জিনৎউন্নিসার মনে হল সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেল তাঁর।

সেই সঙ্গে মনও। আশ্চর্য একটা শান্ত প্রসন্নভাবে মনটা ভরে গেল।

গত রাত্রে একবারও তাঁর চোখে তন্দ্রা নামে নি। তার ফলে দুচোখই শুধু জ্বালা করছে না, মাথা কপাল দুই রগ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। বুখায়ের মতো বোধ হচ্ছে তাঁর।

কিন্তু সেসব গ্লানি সে কষ্ট অস্বস্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল এখানে পা দিতে।

ওঃ, কতকাল তিনি এমন ঘাসের ওপর পা দিতে পারেন নি। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের এক-কোণ-লাল হয়ে ওঠা প্রভাতের আবির্ভাব দেখেন নি।

প্রভাত দেখেন নি—অন্তত বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে—বোধহয় বহুকাল। কতদিন আগে এমন দেখেছেন মনেও পড়ে না।

কি শান্তি। কি আরাম। প্রকৃতি যেন তাঁর এই দুঃখ-পীড়িতা কন্যাকে চারিদিক থেকে এমলিন অপার্থিব স্নেহে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিলেন। নিমেষে সব জ্বালা দূর হয়ে গেল।

চারিদিকে কি মিষ্টি সব ফুলের গন্ধ। নার্গিস হেনা, রাত কি রানী, গুলাব, জুঁহি, বেলি, আরও কত কি ফুল—নাম-নাজানা। এই হিন্দুস্তানের বিশেষ বিশেষ সুগন্ধি ফুলের গাছ এনে লাগিয়ে ছিলেন শাহানশাহ্ শাহ্জাহান—এই কাননভূমিকে এমন বেহেস্তীবাগ ক'রে তুলতে নাকি দু তিন ক্রোড় টাকা খরচ হয়েছিল—তাদের সুগন্ধি নিশ্বাস বুঝি আজও সেই মহান বাদশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখানে, এই বে-জবাব বাগিচার আকাশে বাতাসে।

শুধু কি ফুল—বেলী চম্পক চামেলী জুঁহি নার্গিস গুলাব হেনা, শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের খোয়াবকে সার্থক করতে বুঝি ঐ বড় বড় 'পেড়' বা গাছগুলোও খুশবুদার হয়ে উঠেছে। সে খুশবু এ কিলার উঁচু পাঁচিল ছাপিয়ে বহুদূর পর্যন্ত শিল্পী বাদশার স্বপ্নকল্পনার সার্থকতা, তার তাহ্মিদ বা মহিমা ঘোষণা করছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শাহ্জাদী বেশ কিছুক্ষণ। তিলফুলের মতো দুই নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে এই মিলিত খ্যাত অখ্যাত অসংখ্য ফুলের খুশবু প্রাণের মধ্যে বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে লাগলেন। দুচোখ ভরে দেখতে লাগলেন—দীর্ঘ কাল পরে এই দুর্লভ অবসর মিলেছে—আশমানের ক্ষণে ক্ষণে বদলানো বে-নজীর সুরৎ। যা এতক্ষণ ছেদহীন আঁধিয়ারে সিয়াই বা কালির অতল সমুদ্র বোধ হচ্ছিল, তাই দেখতে দেখতে রূপান্তরিত হল কাবুদ বা নীলকালোয়। তার পরই লাগলো তাতে দীন দুনিয়ার মালিকের ইচ্ছার জাদু—লালের ছোঁয়া। সে অপরূপ অমানবিক জিনৎ বা সৌন্দর্য কোন মানুষের সাধ্য নেই যে আঁকতে পারে বা লেখায় প্রকাশ করতে পারে। অবর্ণনীয় সে তসবির।

আবারও রঙ বদলায়—চেয়ে থাকতে থাকতেই খোদাতালার অপার অনুগ্রহের মতো আঁধারের বিনাশ ঘটিয়ে প্রথম উষার পরমাশ্চর্য আবির্ভাব ঘটে।

তন্ময় হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন শাহ্জাদী জিনৎউন্নিসা। দুই চশম্ ভরে দেখছিলেন এই রঙের জাদু, আশমান ও দুনিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের মর্জির এই আনোখা প্রকাশ।

তবু দেখারও শেষ আছে বৈকি।

উষার পিছনে দিনের আভাস জাগতেই নিজের সম্বন্ধে, এই পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন শাহ্জাদী।

বেশবাস সুবিন্যস্তই ছিল, তবু তাতে হাত বুলিয়ে নিয়ে আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলেন, যেদিকে বড় কয়েকটা

গাছে ও লতায় বেশ একটু ঘন ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখনই নিজের মহলের সোনহেরী খাঁচায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না—আবার একা উনি এইভাবে বেরিয়ে এসে বাগিচায় ঘুরছেন সেটাও জানাজানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যেই ছায়ার অন্তরাল প্রয়োজন।

একটু এগিয়ে গেছেন—একটা জায়গায় আপনিই যেন এক চিপতাহ্ বা লতাবিতানের মতো তৈরি হয়েছে—সেখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ ঘাসের ওপর বসবেন এই ইচ্ছা। অকস্মাৎ একটা কি শব্দ কানে এল। খুব চাপা, সামান্য, তবু শব্দই।

যেন পরিচিত শব্দটা—অথচ ঠিক মনে করতে পারছেন না।

শান্ত, তখনও তন্দ্রাতুর এ উদ্যানে সবে দু একটি পাখীর ডাক উঠেছে। তাও ঐ উঁচু বিলায়তী গাছগুলোর চুড়োতে। কিলার ভিতর এখনও সব নিস্তব্ধ। এ বিপুল প্রাসাদের কোন এক কামরায় হয়ত বাদশা উঠে ফজরের নমাজ পড়ছেন—আর কেউই ওঠে নি।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে এই শব্দটা যেন অপ্রাকৃত বোধ হল প্রথমটায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শাহ্জাদীর।

সামান্য, খুব সামান্য একটা হিসহিস শব্দ।

তবে কি সাপ? কোন বড় বিষাক্ত সাপ? দুই সর্পিণীতে বিবাদ করছে?

তবে তাও তো মনে হল না। অসুবিধাজনক লোককে নিঃশব্দে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে সব কিলাতেই বিষধর সাপ পোষা থাকে। একটা ঘরে তাদের ছেড়ে রাখা হয়, নিশ্ছিদ্র সে ঘর। 'ঐখানে গিয়ে অপেক্ষা করো' বলে যাকে সে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সে একটু চিৎকার করতে, এমন কি কি ঘটছে—তা বুঝতে পারারও সময় পায় না।

এসব ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সে সব সাপ দেখেছেন বৈকি।

তাদের ক্রুদ্ধ স্বরও শুনেছেন। সাপুড়েরাই খোঁচা দিয়ে সে শব্দ করায়, হুজুরাইনদের মনোরঞ্জনের জন্যে।

খুব বেশি শোনে নি, তাও শুনেছে অনেক আগে। তবু মনে হল এ ঠিক তা নয়।

আর এ শব্দটা যেন—অপ্রাকৃত অপরিচিত হলেও নিয়মিত।

জিন? মামদো? দানো? রুহ্?

গায়ের কাঁটা গায়েই মিলিয়েছে বটে, তবে ইতিমধ্যেই 'আরক' বা স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে ললাটে, এই স্নিগ্ধ প্রভাতেও।

অবশেষে জোর করেই মনে ভরসা আনলেন।

তিনি শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের পৌত্রী, সম্রাট আলমগীরের কন্যা। আমির তৈমুরের রক্ত তার ধমনীতে। বাবুর, হুমায়ুঁ, আকবর—এঁদের বংশে জন্ম। ভয় পাওয়া তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার যোগ্য কলঙ্ক, শুধু তাই নয়—গোনাহ্। পাপ।

তিনি সাবধানে তাঁর ভেলভেটের চটি টেনে আর একটু কাছে গেলেন।

প্রকৃতির বিচিত্র মর্জিতেই হোক বা উদ্যানশিল্পীদের ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থাই হোক—ছুটো বড় কি গাছের মধ্যে দু-তিন রকমের লতা উঠে বেশ একটা পর্দার মতো অন্তরাল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জমিন, ঘাসে ঢাকা। ওদিকে পাথরের পাঁচিল, তিনদিকে বৃক্ষলতার এই অন্তরাল। কেউ যেন ইচ্ছা করেই, গোপনতার উদ্দেশ্যে একটু নিভৃতির ব্যবস্থা রেখেছে।

লতার অন্তরাল যতই ঘন হোক নিরবচ্ছিন্ন কিছু নয়, হতে পারে না। মধ্যে মধ্যে একটা চোখ লাগাবার মতো ফাঁক আছেই।

তারই একটায় খুব সন্তর্পণে চোখ লাগালেন শাহ্জাদী।

যা দেখলেন তা তিনি কখনও ভাবেন নি।

এমন দৃশ্য দেখেনওনি। দেখা সম্ভবও নয়।

তাঁরা যে জীবনে অভ্যস্ত, যেভাবে মানুষ হয়েছেন বড় হয়েছেন—তাতে ভাই কাকা প্রভৃতি নিকট আত্মীয় ছাড়া কাছে থেকে কোন পুরুষই দেখেন নি কখনও। দূর থেকে—ঝরোখা কি পর্দার মধ্যে থেকে তা দেখেছেন—তাতে প্রকৃতিদত্ত চেহারায় কাউকে দেখবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওঁদের মহলে সেবা করে ক্রীতদাসীরা, পাহারা দেয় তাতারিনীরা। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

হয় এই প্রহরিণী বা নৌকরনীদের মারফৎ। ওঁদের প্রয়োজনের কথা তারা জানায় খোজা প্রহরীদের—তারা জানায় বেগম মহলের বাইরে যে সব ফৌজী রক্ষীরা পাহারা দেয় তাদের। তারা সে প্রয়োজনের কথা—বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝে শাহী নিজামতে পেশ করে—অথবা মীর বক্সী কি মীর-ই-বকাওয়ালকে জানায়। কোন প্রয়োজনীয় কথা হলে আলা হজরতের খাস মুন্সী কি খাস নৌকর মারফৎ একেবারে তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়।

সুতরাং পরপুরুষের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই নেই তাঁদের। সে ক্ষেত্রে কোন পুরুষকেই অনাবৃত দেহে দেখার কোন সম্ভাবনাও নেই। তাই বা কেন, ভাই চাচা এদেরই কি সেভাবে কখনও দেখেছেন? তসবীর দেখেছেন অনেক, কিতাবেও দেখেছেন —তবে সে তো সবই সুসজ্জিত অবস্থায়।

প্রথমটা তাই চোখ পড়ামাত্র কতকটা লজ্জায় কতকটা ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন। তবে সে ঐ নিমেষ মাত্রই। লজ্জার চেয়ে কৌতূহল ঢের বেশি বলবান। আবারও তাই চোখ খুলে ভালভাবে তাকিয়ে দেখলেন।

একটি অল্পবয়সী তরুণ ছেলে। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। অনেকটাই ছোট হয়ত। আঠারো উনিশের বেশি বয়স হবে না। অপূর্ব রূপবান। আরব্যরজনী কিতাবে যেসব রাজপুত্র শাহ্জাদাদের তসবীর দেখেছে, তাদের চেয়েও ঢের বেশি। সমস্ত দেহই প্রায় অনাবৃত; কটি-দেশেরও নিচে একটা কি ত্রিকোণ কুর্তা বা পায়জামার মতো আছে—হয়ত একটা লুগা বা বস্ত্রখণ্ডই এইভাবে পরেছে—নৌকররা যাকে বলে লঙ্গুটি—এও হয়ত তাই। কিছুদূরে পোশাকের মতো কি পড়ে আছে—বোধ হয় ওরই ছাড়া পোশাক। ছেলেটা সমস্ত শরীর সোজা রেখে দুটো হাত দুপাশে লম্বা ঝুলিয়ে 'উঠবোস' করছে। তাইতেই ঐ হিসহিস নিঃশ্বাসের শব্দ উঠছে। হয়ত অনেকক্ষণ ধরেই করছে—তার ফলে নিঃশ্বাস জোরে পড়ছে অত—আর তাতেই ওর সুগৌর সফেদ মুখটা অত লাল হয়ে

উঠেছে ; সমস্ত শরীর পশিনায় ভিজে গেছে, মনে হচ্ছে কে গাগরী ভরে পানি ঢেলেছে ওর সর্বাঙ্গে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন শাহ্জাদী এই আজব দৃশ্যের দিকে।

পলকও পড়ছে না তাঁর, তা না পড়তেই পারে—এমন তিনি দেখেন নি কখনও, এমন রূপবান মানুষও নয়। বিশেষ অনাবৃত দেহে যে পুরুষেরও সুরৎ এত খোলে তাও জানতেন না, এখন যত দেখছেন তত মুগ্ধ হচ্ছেন। সুন্দর, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো নিখুঁত মুখে সামান্য একটু দাড়ির রেখা, বুকে দু তিনটি চুলের আভাস।

চোখ না ফেরাতে পারার অনেক কারণ—কিন্তু বুকের মধ্যে এত তোলপাড় হচ্ছে কেন? যেন ঝড় বইছে। সে তুফানের শব্দ, মনে হয় বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে, এত প্রবল তার বেগ। আর সেই ভাবটা। কোন বলবান পুরুষের আলিঙ্গনে পিষ্ট হওয়ার সেই অদম্য বাসনা। তার দ্বারা নির্জিত হওয়ার।

এমনি যদি কাউকে পেতেন তিনি। এর বাঁদী হয়েও সুখ, এঁর লাথ খেলেও আনন্দ।···

এতক্ষণে বোধহয় ওর উঠবোসের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে থাকবে।

সে স্থির হয়ে দাঁড়াল এবার। সুডৌল দুটি আঙুলে কপালের ঘাম মুছে মাটিতে ফেলে একবার চারিদিকে তাকাল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল তার শাহ্জাদীর দিকে।

দুজনেরই চোখে চোখ মিলল।

শাহ্জাদী একটা প্রায় অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন—কিছুটা লজ্জা কিছুটা ভয় মেশানো, কিন্তু তাঁর পা ততক্ষণে পাথর হয়ে গেছে—তিনি চলেও যেতে পারলেন না, চোখও ফেরানো গেল না। সেই ভাবে, বেঅকুফের মতো চেয়েই রইলেন।

আরও চোখ ফেরাতে পারলেন না তার কারণ ঐ ছেলেটার ললাটে কপোলে কণ্ঠে অপূর্ব রঙের খেলা।

পরিশ্রমের লালিমা নিবিড়তর হয়ে উঠল, লজ্জায় রক্তাভায় ;

তার পর যেন কোন অজানা ভয়ে মুখ থেকে সমস্ত রক্ত চলে গিয়ে ছাইয়ের মতো পাণ্ডুর হয়ে গেল।

তারপর যা কাণ্ড করল পাগলের মতো প্রায়।

বলতে গেলে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল ওর সেই ছাড়া পোশাকগুলোর ওপর। পাজামা, কুর্তা, ওপরের একটা আধাকুর্তা। সেগুলো নিয়ে—এপাশের চামেলি আর একটা কি মোটা লতা যেখানে মেশামেশি ক'রে এপাশের বড় গাছটার শাখা-প্রশাখায় নিজেদের পত্রপল্লব বিস্তার ক'রে অপেক্ষাকৃত ঘন আস্তরণ তৈরি করেছে—সেখানে গিয়ে একহাতে সেই লতাগুলো আর একটু নামিয়ে আবডালটা ঘনীভূত করার চেষ্টা করতে করতে আর এক হাতে পাজামাটা পায়ে গলাবার দুঃসাধ্য সাধন শুরু করল।

ওর এই ব্যাপার দেখে প্রচণ্ড হাসি পেল শাহ্জাদীর।

কিন্তু প্রচণ্ডতর চেষ্টায় সে কৌতুক দমনও করলেন তিনি।

আসলে ওর মধ্যেই আশঙ্কাটাও প্রবল হয়ে উঠেছে। এমনিই বেচারার লজ্জার সীমা নেই, তারপর উনি হেসে উঠলে এই অবস্থাতেই কোথায় দৌড় দেবে,—এত গাছপালায় অদৃশ্য হওয়া এমন কিছু কঠিন নয়—আর কখনও হয়ত ওর পাত্তাই পাবেন না।

অথচ সেটা দরকার। খুব বেশি রকম দরকার।

ওঁর মনের মধ্যে সমস্ত শিক্ষা সংস্কার আদব একাকার হয়ে গেছে—অকস্মাৎ এতদিনের প্রায়-বিবর্ণ একঘেয়ে জীবনে আবেগের প্রবল ঝড় উঠেছে।

ওর পরিচয় চাই, কোথায় থাকে সেটাও জানা দরকার।

ভবিষ্যতে যোগাযোগ করার সূত্রটা না নষ্ট হয়ে যায়।

তার ভিতরেই মনে একটা ক্ষোভও দেখা দিল—সেটা শাহ্জাদী লক্ষ্য ক'রে নিজের মনোভাবে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন—এত জরুরৎ কি ছিল এখনই এই সব জোব্বাজাব্বা চাপানোর। ঘামটা একটু শুকিয়ে নিলেই তো পারত।...

কিন্তু এসব চিন্তার সময় নেই আর। ছেলেটা যা তাড়াতাড়ি করছে, আর হয়ত দু-এক লহমার মধ্যেই হাওয়া হয়ে যাবে।

প্রাণপণ চেষ্টায় গাম্ভীর্য ও ঈষৎ ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলে তাই শাহ্জাদী প্রশ্ন করলেন, 'এই, তুমি কে? তোমার নাম কি? কোথায় থাক? এখানে কি ক'রে এলে? এখানে কোন কাম করো নাকি?'

অপেক্ষাকৃত মোলায়েম ভাবেই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে হল। বেশি রূঢ় হওয়া চলবে না, ভয় পেয়ে পালাবে।

ছেলেটি যেন ওঁর এই কণ্ঠস্বরেই কিছু আশ্বাস পেলে। মাম্দ-দেখার-মতো ভয়ের ভাবটা কাটল একটু। ততক্ষণে পাজামাটা পরা হয়ে গিয়েছিল—কুর্তাটা হাতে। তবু তাতেই লজ্জাটা একটু কমেছে (শাহ্জাদীরও ভাল লাগছে অনাবৃত ঊর্ধ্ব দেহটা দেখতে) সে সোজা হয়ে একটা সেলাম করার ভঙ্গী করে বলল, 'এ বান্দার নাম আনোয়ার। আনোয়ার হোসেন। কিন্তু আপনি কে, যদি গুস্তাকি না ধরেন, জানতে ইচ্ছে করছে।'

চমৎকার বলার ভঙ্গী। বলার আওয়াজে আর কথার ধরনে বোঝা যায় সাধারণ কোন নৌকর শ্রেণীর লোক নয়। ভদ্রমহিলার সামনে অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টি নত করাই রেওয়াজ—সে জ্ঞানও আছে—সেইভাবেই ঘাড়টি নামানো—তবু তার মধ্যেই কি অপূর্ব কৌশলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধুই কি কৌতূহল? শাহ্জাদীর ভাবতে ভাল লাগল—একটু যেন মুগ্ধতার ভাবও আছে সে দৃষ্টিতে।

এবার তিনি একটু ভাবে ভঙ্গীতে 'সার আফরাজী' বা মর্যাদার ভাব এনে বলেন, 'আমি দীন দুনিয়ার মালিক শাহানশাহ্ বাদশা আলমগীরের পুত্রী—আমার নাম জিনৎউন্নিসা।'

শাহ্জাদী ভেবেছিলেন ছোকরা ভয় পাবে।

অথবা সসম্ভ্রম কৌতূহলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকবে—একটু অবাক হয়ে।

কোন শাহ্‌জাদীকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ কোন সাধারণ পুরুষের হয় না। সেই জন্যেই বিস্ময় ও ভয় আশা করেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল অবাক হওয়ার পালা তাঁরই।

উনি দেখলেন কেমন ক'রে আনোয়ারের সুন্দর কচি কোমল মুখখানা ওঁর চোখের সামনেই আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠল, আয়ত চোখের প্রসন্ন দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটা অপরিসীম ঘৃণা।

সে আস্তে আস্তে রীতিমাফিক প্রায় আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ওদিকে মুখ ক'রে দুটো সুগন্ধি গাছের [ইউক্যালিপটাস জাতীয় অনেক গাছ মুঘলদের উদ্যানে থাকত। এখনও কোন কোন শাহী বাগিচায় তার প্রমাণ দেখা যায়। এছাড়া গুলমোর চিনার দেওদার এসব তো ছিলই।] মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল।

এক লহমা মাত্র সময়। তার মধ্যেই জিনৎউন্নিসার সমস্ত জীবনধারণায় যেন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। মনের মধ্যে চিন্তার মধ্যে আবেগের যে প্রচণ্ড ঝড় উঠল তাতে আভিজাত্যবোধ, শিক্ষাসংস্কার সানসওকত তমদ্দুন আদব সব কোথায় উড়ে চলে গেল।

কি করছেন, কেন করছেন, তার কি ফলাফল তা বোঝবার কি ভাববার আগেই, যাকে বলে বিদ্যুৎগতিতে গিয়ে আনোয়ারের একটা হাত ধরলেন। বেশ চেপেই ধরলেন—শাহ্‌জাদীদের হাত যে কুসুম-কোমল নয়—শাসকবংশের শক্তি ও স্বাস্থ্য নিয়েই তাঁরা জন্মান, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয়।

হাত ধরাই শুধু নয়, পথও আগলে দাঁড়ালেন সেই সঙ্গে।

দুই চোখে আগুন তাঁর—কিন্তু সে কি শুধুই এর স্পর্ধা দেখে—না কামনার বহ্নিও জ্বলে উঠেছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই?

চাপা কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'খবরদার। চলে যাচ্ছ যে। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি, তুমি উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছ। এত হিমাকৎ তোমার, এত দিলাবরী! কি ভেবেছ তুমি! তুমি কে তা জানি না, কি মতলবে বেগম মহলের বাগিচায় ঢুকেছ—এখনই যে

কোন পাহারাদারের নজরে পড়লে তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে তারা। এত সাহস কিসের তোমার?'

যা বলা উচিত ছিল তা কিছুই বলা হল না। কেমন যেন খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলেন।

ওর বাহুমূলের কাছটা চেপে ধরতেই এই বিপত্তি। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ওলটপালট করা সেই মনোভাব—ওকে দেখে যেমন হয়েছিল প্রথমেই। কদিন মনের মধ্যে যে প্রবল অজানা আবছা তৃষ্ণা জেগেছে, এ সেই অবর্ণনীয় উদ্দামতা। এই আনজান ছোকরার জন্যে কি তিনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

আনোয়ার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। সেটা বেয়াদবি হবে, অমার্জনীয় অভব্যতা। তেমন ক্ষেত্রে পাহারাদারদের ডাকা ছাড়া শাহ্জাদীরও উপায় থাকবে না।

সে চেষ্টাও যেমন করল না, তেমনি সম্রাট-দুহিতার স্পর্শে যে অভিভূত হয়েছে, তেমন কোন ভাবও প্রকাশ পেল না।

সে স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইল, পাথরের মতো।

কোন লজ্জা বা কুণ্ঠাও প্রকাশ পেল না তার আচরণে। দৃষ্টি আনত রাখার কোন চেষ্টাও দেখা গেল না, সোজা বাদশাজাদীর মুখের দিকেই চেয়ে রইল।

'কী, উত্তর দিচ্ছ না যে।' অনেক চেষ্টায় আবারও বললেন, জিনৎউন্নিসা, তবে কণ্ঠস্বর এখনও রূঢ় শোনাল না।

এবার উত্তর দিল আনোয়ার। শান্তভাবেই বলল, 'ঠিকই ধরেছেন শাহ্বেগম। জানের পরোয়া করি না বলেই এত হিম্মাকৎ।'

'জানের পরোয়া করো না—এই কাঁচা বয়সে। সে কি!'

আপনিই বেরিয়ে গেল কথাটা।

'উমরে কি এসে যায় হজরৎ। কাঁচা বয়েস বলছেন? এই বয়সে অনেক উমীদ থাকে, বহুত বুলন্দ হিম্মত। কত কি খোয়াব দেখে—জীবনে এই করব, এত বড়ো হবো। যার সে সব কিছুই নেই, সে

জানে মৃত্যু—কলঙ্কজনক মৃত্যু তার সামনে—সে ভয় পাবে কেন জনাব-এ-বেগম।'

'তুমি, তুমি কি বলছ আনোয়ার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।··· তুমি, তুমি একটু বসবে এখানে? ক্রমশ ফজর কায়েম হচ্ছে, এখন একটু বাজে লোকের নজরের বাইরে থাকাই ভাল।'

আনোয়ার একটু ইতস্তত করল, যেন কিছু একটা রূঢ় জবাবই দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু শাহ্জাদীর চোখে আদেশ নয়, মিনতি দেখে সামলে নিল নিজেকে।

'তুমি এখানে কোথায় থাকো আনোয়ার, কি করো?'

'থাকি?' একটু হাসলো আনোয়ার। তিক্ত হাসি। বলল, 'সে আর এক শাহ্জাদীর মহলে।'

'শাহ্জাদীর মহলে? সে কি। কোন্ শাহ্জাদী তিনি?'

আবারও সেই তিক্ত হাসি, 'আপনার গুরুজন, নিকট-আত্মীয়া ফুফীজান। হজরৎ রৌশনআরা বেগম সাহেবা।'

'ফুফীজান? রৌশনআরা বেগমের মহলে থাকো তুমি! কী আশ্চর্য। সেখানে তো কোন মরদের থাকার কথা নয়। এ যে ভয়ঙ্কর কথা। এমনি এখানে তুমি এসেছ, এও তো বেআইনী কাজ। অপরাধ।'

'জনাব-এ-বেগম, যদি গুস্তাকী মাফ করেন তো আপনাকে মনে করিয়ে দিই—এইভাবে একা এ বাগিচায় ঘুরে বেড়ানো আপনার পক্ষেও বেআইনী নয় কি? তফাৎ হচ্ছে আপনি ধরা পড়লে হয়ত বকুনি খাবেন আলা হজরতের কাছে, হয়ত কৈফিয়ৎ তলব করবেন তিনি, আমাকে ধরলে সোজাসুজি কয়েদখানা ব্যবস্থা, চাই কি জানও যেতে পারে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝেছি।' অসহিষ্ণুভাবে বলেন শাহ্জাদী, 'কিন্তু তুমি ওখানে কি করো সে জবাবটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?'

'এড়িয়ে যাবারই কথা যে হুজুরাইন, শুনলে আপনিও স্বীকার করবেন। তবে বলেই দিচ্ছি। কথাটা আপনার সামনে উচ্চারণ

করতেও লজ্জা করছে। যে আওরৎ নিজের সুরৎ বিক্রি ক'রে জিন্দিগী চালায়, রোজগার করে, তাকে বলে কসবী। যে পুরুষ এই কাজ করে, এই ধরনের রোজগার, নিজের 'টান' বা বদন বিক্রি করে, নিজের সুরৎ—তাকে কি বলে জানি না হুজরৎ, আপনারা অনেক পড়েছেন আপনারা বলতে পারেন।'

'তা—তার মানে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আনোয়ার—তুমি কি বলছ!'

বলতে বলতেই হঠাৎ থেমে যান শাহ্‌জাদী, অন্ধকারের মধ্যে একটা কি আলো এসে পড়ে মনের মধ্যে।

এই কিছুদিন আগেকার একটা বুরা কিস্‌সা মনে পড়ে যায়।

তবে কি—তবে কি এখনও সেই কাজ চলছে? সেইভাবে?

আনোয়ার প্রশান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিল। শাহ্‌জাদীর মুখে গভীর রক্তাভা, দৃষ্টিতে প্রথম বিস্ময়, বিহ্বলতা পরে সুগভীর লজ্জা—কিছুই তার চোখ এড়ায় নি। সে বলল, 'জী হুজরৎ, এবার ঠিকই ধরেছেন।'

'সে কি—সে কি তোমরা স্বেচ্ছায় আসো না?'

'না। কেউ কি তা আসে। সমবয়সীও না, উনি আমার মায়ের বয়সী, তার চেয়েও বড়। টাকার লোভ দেখিয়ে আনলে ভদ্রঘরের ছেলে পাবেন না, সিপাহীদের মধ্যে থেকে নিতে হবে কিংবা আরও নিচু ঘরের লোক। তাদের লজ্জা ঘেন্না নেই, তারা একথা চারিদিকে রটনা করবে, চুরি ডাকাতিও করতে পারে। উনি চান বড় ঘরের, একেবারে নওজওয়ান ছেলে, খুবসুরৎ—যারা ঘেন্নায় একথা কাউকে বলতে পারবে না; পালাবার চেষ্টা করবে না। ওঁর মাইনে করা কিছু হাবসী খোজা আছে তাদের জিভ্‌কাটা, তারা কোন কথা কাউকে বলতে পারবে না। তিনি তাদের এর বদলে অনেক সুখ-সুবিধে দেন, তারা নিজেদের মতো ভোগ করে। তাদের আওরতও দেন। এই সব দানোগুলো—হ্যাঁ জনাব, এদের চেহারাও যেমন দানোর মতো, স্বভাবও তাই—এরা হঠাৎ কোন ফাঁকে, বড় ঘরের

ভাল ছেলে পেলে চুরি ক'রে নিয়ে আসে—কেউ জানতেও পারে না কোথায় গেল। আপনার ফুফী বেগম সাহেবা প্রথমে এত কড়াকড়ি করতেন না, কিছুদিন আগে ধরা পড়ে যাওয়ায় খুব বেইজ্জৎ হতে হয়েছিল—সেই জন্যে বলতে গেলে এখন ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। দশজন আছি আমরা। ওঁর প্রতি রাত্রে, রাত্রে কেন দিনেও—মোট তিন চারজন করে লাগে। আমাদের ভাল খেতে দেন, গোসল করার খুব ভাল ব্যবস্থা, পোশাক-আশাকও ভাল—কেন না আমরা ভাল থাকলে ওঁরই কাজে লাগবে। তবে মুক্তি নেই। আজও না, কোনদিনই না।'

'তা কেন বলছ, ওঁর অরুচি হলে?'

'ওঁর অরুচি হলে সোজা সাপের মুখে কি ঐ দানোগুলোর তলোয়ারের মুখে যেতে হবে। কেন না উনি জানেন যে আমরা বাইরে গেলেই এই কহানী সবাইকে বলে বেড়াব। আর, তাহলে সেকথা বিভিন্ন চৌক বাজারে ইতর তামাশার খোরাক হয়ে দাঁড়াবে।'

'সে কি!' বুকের ভেতরটা যেন হিম হতাশায় ভরে যায় শাহ্জাদীর। 'কোন আশা নেই? না না, তা হতে পারে না। খোদাতায়ালার খুশিতে চলছে এই জাহান—এখানে এমন পাপ, এমন গোনাহ্? না না, তা হতে পারে না।'

আবারও সেই হাসি আনোয়ারের, বলল, 'খোদার খুশির মধ্যে জামালও আছে জাহান্নামও আছে বেগম সাহেবা।'

'কিন্তু, কিন্তু', জিনৎ যেন অস্থির হয়ে ওঠেন, 'কিন্তু তুমি যে এই বেরিয়ে এসেছ? এখানে কি রোজই আসো? ফুফীজান কিছু বলেন না?'

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল আনোয়ার। বোধহয় শাহ্জাদীর এই আকুলতার কতটা সত্য আর কতটা কৃত্রিম বোঝার চেষ্টা করল। তারপর একটা ঝুঁকি নেবার মতো করেই বলে উঠল, 'মাফ করবেন হজরত বেগম সাহেবা, এমন নোংরা কথা তুলতে

হচ্ছে বলে। এইটুকু মুক্তির জন্যে আমি বেগম সাহেবাকে বুঝিয়েছি, যে দেহটা তিনি ভালবাসেন, সে দেহটা যাতে সে পিয়ার-মহব্বৎ-এর যোগ্য থাকে সেটা তো দেখা উচিত। একটু কসরৎ করতে না পারলে টান তৈরী হবে না, মেয়েদের মতো নরম শরীর কি তাঁর ভাল লাগবে? উনি বুঝেও ছাড়তে চান নি, বলেছিলেন ঘরের মধ্যেই করো না। আমি সাফ জবাব দিয়েছিলুম, তা হয় না, খোলা হাওয়ায় না করলে কসরতের উলটো ফল হয়। তাতেই শেষপর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন উনি। বোধহয় এত কাটাকাটা কথা আর কারও কাছ থেকে শোনেন নি বলেই ইশকটা আমার ওপর বেশি পড়েছে। তবু প্রথম প্রথম ক'দিন তাঁর এক বাচ্ছা নফর, পিশ খিদমৎ—পাঠিয়েছিলেন আমার ওপর নজর রাখার জন্যে। আমি সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলুম—কিন্তু ওঁকে কিছু বলিনি। তারপর—আমি ঠিক ঠিক, খাঁচার পাখি খাঁচায় ফিরে যাচ্ছি দেখে নিজেই নজর রাখা বন্ধ করলেন একদিন মেহেরবানি ক'রে। তবু সাবধানেই থাকি—কোন দিন কাকে পাঠাবেন তার তো ঠিক নেই।'

এবার জিনৎউন্নিসা ওর চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন. 'এর আসল মতলব—আমি যা আন্দাজ করছি—নিশ্চয়ই তাই?'

কয়েক লহমা স্থির হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে, 'বোধহয়। আপনার আন্দাজ কি তা তো বলেন নি, আমিও সেটা আন্দাজ করছি। শেষ কোশিস একটা করব বৈকি। সেই জন্যেই শরীরটা ঠিক রাখছি—মেহনতে না ভেঙে পড়ি।'

তারপরই চারিদিক তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু এবার বেশ ফরসা হয়ে আসছে। লোকজন উঠে পড়বে। আমাকে হুকুম দিন, আমি চলে যাই।'

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শাহজাদীও। আবারও ওর একটা হাত ধরে বললেন, 'কিন্তু আমার যে অনেক কথা আনোয়ার। এখানেই ছেদ টানলে তো চলবে না। আবার কোথায় কিভাবে

দেখা হবে—কখন—বলে দাও। যদি শেষ রাত্রে আসতে বলো তাও আসব—'

ব্যাকুলতা চাপা থাকে না কণ্ঠে।

সত্যকার ব্যাকুলতা।

বেশ একটু অবাক হয়ে গেল আনোয়ার।

সেই সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার রেখাও ফুটে উঠল ওর সুন্দর মসৃণ ললাটে।

'আর কেন আমাকে জড়াচ্ছেন বেগম সাহেবা। আমার জিন্দিগী শেষ হয়ে এসেছে, এভাবে আমার বাঁচতেও সাধ নেই।'

কথা বলতে বলতেই গলাটা আবারও কঠিন হয়ে এল, 'বুঝছি শাহী হারেমের ধারাই এই। তাঁর পছন্দ হয়েছিল, ধরে এনেছেন। কিংবা ধরে আনার পর পছন্দ হয়েছে—আমি ঠিক জানি না, এ নিয়ে মাথাও ঘামাই না আর। এখন আপনার পছন্দ হয়েছে। আপনি হয়ত আপনার ফুফীকে বলে আমার মালিকানা নিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমার কি অবস্থা দাঁড়াবে? এক মালেকা থেকে আর এক মালেকা, এক খাঁচা থেকে আর এক খাঁচায়। আমাকে অব্যাহতি দিন বেগম সাহেবা, আমি ভিক্ষা চাইছি। এভাবে খানগীর জীবন যাপন করা—বিনা পারিশ্রমিকে—অসহ্য। মরদের এর চেয়ে বড় অপমান আপনি ভাবতে পারেন? এর চেয়ে নখাশে বিক্রি হয়ে যাওয়াও ভাল। সে যারা কেনে তারা মেহনতের শক্তি দেখে, সুরতের জন্যে পুষতে নেয় না।'

এবার শাহ্‌জাদীর কণ্ঠেও অন্য সুর ফোটে।

আকুলতাই যেন ব্যঙ্গ-শাণিত রূপ নেয়।

'তাও নেয় আনোয়ার, সুন্দর মেয়ে কেন কেনে? খুবসুরৎ লওণ্ডাও কেনে—একই কারণে। মহামাননীয়া উদীপুরী-মহল বেগম সাহেবাও একসময় নখাশে বিক্রি হয়েছিলেন।'

কিন্তু তারপরই ওর দুটো হাত ধরে আবার মিনতির সুরে বলেন, 'না আনোয়ার, তোমাকে সবদিকে আমি অপমান করতে চাই না।

তোমার মালেকা হওয়ারও ইচ্ছে নেই আমার। আমি চাইছি তোমাকে এ খাঁচা থেকে মুক্ত করতে—বহু দূর দেশে কোথাও পাঠিয়ে দিতে, যাতে তোমার তকদির আর তাকতে তোমার জিন্দিগী তুমি নিজে তৈরী করে নিতে পারো। তুমি আমাকে অবিশ্বাস ক'রো না আনোয়ার, আমি সাচ বলছি। বাদশার ঘরের মেয়ে আমি, বাবুর শার লোহু আমার শরীরে—মিথ্যে কথা বলি না। আমি তোমার কথা ভাবছি। আর, মালেকা হবার সাধ আমার নেই—যদি কোন দিন তোমার মতো কারও মুহব্বৎ পাই, তার বাঁদী হয়ে থাকব, মালেকা নয়। তেমন মরদকেই ভালবাসব আমি, তারই ভালবাসা চাইব—যে আমার দিলের মালিক হ'তে পারবে, বান্দা নয়।'

যেন চমকে ওঠে আনোয়ার। বিস্ময়ের সীমা থাকে না তার।

এ সব কি শুনছে ও!

এমন কথা এ পাপপুরী, এই লোহুর রঙে রাঙানো প্রাসাদে কেউ কি বলে?

সত্যিই শুনেছে তো?...

তারও মনটা এমন ক'রে দুলে ওঠে কেন।

তবে কি পৃথিবীতে এখনও সাচ্চা মানুষ আছে—জীবনে আছে আলো আর আশা। আছে সত্যকার মুহব্বৎ।

উত্তর দিতে গিয়ে তার গলা কেঁপে যায়, বলে, 'কিন্তু বেগম সাহেবা, আপনি কতটুকুই বা আমাকে দেখলেন—আধা ঘড়িও তো হয়নি এখনও। এরই মধ্যে এত মেহেরবানি আমার ওপর পড়ল কি ক'রে!'

'তা জানি না। ইশক মুহব্বৎ পেয়ার সময় হিসেব ক'রে আসে না আনোয়ার। বখ্‌ৎ কি দিন-রাতের হিসেবে আসে, না, একবার চোখে চোখ পড়লেই হল। কিন্তু সে কথা থাক—তুমি বল আবার কোথায় কি ভাবে তোমার দেখা পাবো। আর সময় নেই।'

উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় আনোয়ারেরও।

তারও বুঝি দিলে সেই মুহব্বতের ছোঁয়া লেগেছে—যা এক লহমায় বহু মুদ্দাত বা যুগ পার হয়ে যায়।

কোন খত্‌রার কথা আর ভাববে না সে, ভাবা সম্ভব নয়।

'এর একটু আগে আসবেন। আপনি আপনার মতো বেড়াবেন, আমি আপনাকে খুঁজে নেব।' বলতে বলতেই কুর্তাটা পরে নিয়ে গাছপালার আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

॥ চার ॥

মনের তুফান বাইরেও কিছু চিহ্ন রাখবে বৈকি।

যে যতই চেষ্টা করুক মনের ভাব মনেই চেপে রাখতে—পারে না।

মুখের আরশিতে মনের চেহারার ছাপ পড়ে।

জিনৎউন্নিসার ভাবভঙ্গী দেখে সেবিকারা অবাক হয়ে যায়। নানারকম 'সোবে' বা সংশয় দেখা দেয় মনে। কিছুদিন ধরেই ওঁর ভাবগতিক তাদের বিস্ময় আর কৌতূহলের কারণ হয়ে উঠেছিল, আজ তো মনে হল 'মুন্নী' [মুন্নি খুকী শব্দের উর্দু প্রতিশব্দ। খোকা মুন্না, খুকী মুন্নী।] বেগমসাহেবা একেবারে বাওরা দিওয়ানা হয়ে গেছেন।

গুম খেয়ে বসে থাকছেন; আপন মনে চুলের বেণী ধরে টান দিচ্ছেন—যতক্ষণ না যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায়। কখনও এটা ওটা—আতরদান গুলাবপাশ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, অকারণেই দাসীদের বকাবকি করছেন। সারাদিন না করলেন গোসল, না খেলেন খানা। একটা পান পর্যন্ত মুখে দিলেন না। মীর-ই-বকাওলকে খবর দিয়ে হেকিম ডাকবে কিনা—এক সময় এমন প্রশ্নও ওদের মনে দেখা দিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সহজভাবে গোসল ক'রে একটু আঙুরের রস পান করতে ও তার পর সযত্নে প্রসাধন করতে দেখে ক্রমশ আশ্বস্ত হল।

'সোবে'টা এবার অন্য পথ ধরল। স্বাভাবিক সহজ পথ।

আগেই সে কথা চিন্তা করা উচিত ছিল।

এ অবস্থা সব তরুণ-তরুণীর জীবনেই আসে কখনও না কখনও।

সে ক্ষেত্রে দাসী কি মালেকা বিচার করে না দেহ-মনের সনাতন নিয়ম।

নিশ্চয় আশনাইয়ে পড়েছেন মুন্নী বেগম। কোন পিয়ারা আশিক কেউ আছে—যে বেগম সাহেবার মাথা গোলমাল ক'রে দিচ্ছে।

কিন্তু কে সে? কই, ধারে কাছে তো কোন পুরুষ দেখা যাচ্ছে না। কেউ তো ওঁর মহলের সীমানায় আসে নি।

তবে?

কেউ এলে ধরা পড়তই, এসব কথা এখানে গোপন থাকে না। এতগুলো চোখ এখানে চেয়ে আছে এঁদের দিকে, বড়ঘরের গুপ্তকথা বার করলেই পয়সা। বকশিশই বলো আর ঘুষই বলো।

. এ ক্ষেত্রে এই রহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের কোন পথই খুঁজে পায় না—কিন্তু সন্দেহটাও যায় না। চোখ আর কান দুটোই খুলে রাখার চেষ্টা করে।

অরুণোদয়ের তখনও বহু বিলম্ব আছে, উষার আভাসই জাগে নি তখনও পর্যন্ত। ত্রিপোলিয়ার ফটকে তিন ঘড়ি বাজার কিছু পরেই উঠে পড়েছেন জিনৎউন্নিসা।

উঠে পড়েছেন বলাও ভুল। যে আদৌ ঘুমোয় নি সে আর উঠবে কি ক'রে। শয্যা ত্যাগ করেছেন বলাই উচিত।

শয্যা ত্যাগ করতেই তো ভাল লাগছে তখন।

অতন্দ্র অবস্থায় খুব কোমল শয্যাও কণ্টকাকীর্ণ মনে হয়।

তবে উঠলেও তখনই ঘর থেকে বেরোনো যায় না। পাথরে গর্ত ক'রে উপরে ও নিচে কপাট বসানো—গত রাত্রে নিজে তেল দিয়ে রেখেছেন বেগম সাহেবা, যাতে কপাট খোলার কোন শব্দ না হয়। তারপর প্রহরিণীদের চোখ এড়িয়ে যাবার সমস্যা, সে বড় কঠিন কাজ। তারা শেষ-রাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ই, তবু কতটা গভীর সে তন্দ্রা সেটাও দেখা দরকার।

তার জন্য যত রকম পরীক্ষা জানা বা শোনা আছে সবই ক'রে দেখেন তিনি।

এই সব সতর্কতাতে বহু সময় চলে যায়।

অবশেষে এক সময় নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটো তিনটে দেউড়ি পেরিয়ে বাবুর্চিখানায় নৌকরদের আসা যাওয়ার পথ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। গায়ে গাঢ় সবুজ রঙের বুরখা, অন্ধকারে মিশে থাকবে, বাগানে পড়লেও গাছের পাতার সঙ্গে আলাদা মনে হবে না।

বাইরে পা দিয়ে সবে অনেক ফুলের মিলিত সুগন্ধ মন ভরে নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছেন—সেই অন্ধকারেই যেন মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে একজন এসে একেবারে সামনে দাঁড়াল। আনোয়ারকে আশা করেছিলেন ঠিকই, তবে এমন অতর্কিতে এত শীঘ্র দেখবেন ভাবেন নি। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে যেত—যদি না আনোয়ার ব্যাপারটা অনুমান ক'রেই নিমেষের মধ্যে বেগম সাহেবার মুখটা চেপে ধরত।

বলিষ্ঠ তরুণের হাত।

এ স্পর্শ কখনও তকদীরে জোটে নি জিনতের।

অপরিসীম বিস্ময় ও অপরিমাণ আশঙ্কার মধ্যেও দেহে রোমাঞ্চ জাগে তাঁর।

'মাফ করবেন বেগম সাহেবা। আমি আপনার বান্দা আনোয়ার। একটুখানি শব্দও বহু দূর যায় এই নিশীথ-রাত্রে, তাই এতখানি স্পর্ধা প্রকাশ করতে হল।'

প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল আনোয়ার।

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই হাতে মৃদু একটা টান দিয়ে হলদে আর লাল চামেলির লতা যেখানে এক কুঞ্জবনের সৃষ্টি করেছে—অন্ধকারটা সেখানে গাঢ়তর—সেইখানে নিয়ে গিয়ে থামল।

তারপর খুব মৃদু অথচ বিচলিত কণ্ঠে—মুখখানা প্রায় জিনতের কানের ওপ'র চেপে ধরে, যাতে খুব কাছের লোকও না শুনতে পায়—বলল, 'হজরৎ বেগম সাহেবা, কাল আমার ফিরতে একটু দেরি হয়েছে তা আপনার ফুপ্পীজান লক্ষ্য করেছেন, সে সম্বন্ধে সামান্য একবার প্রশ্নও করেছেন—কসরৎ করতেই যদি দেরি হয়ে থাকে তো পসিনা শুকোল কেমন ক'রে এর মধ্যে? আর বেশি কিছু বলেন নি,

কিন্তু আমি দেখেছি আমার ওপর যখনই চোখ পড়ছে—তখনই যেন সবুজ সাপের চোখের মতো একটা আলো জ্বলে উঠছে তাতে। মনে হয় আজ কোন পিশ-খিদমৎকে* পাঠাবেন আড়ালে থেকে দেখবার জন্যে। আপনি মেহেরবানি ক'রে একটু ধৈর্য ধরবেন—আমার কসরতের জায়গায় যাবেন না। আমি একাই কসরৎ করছি, কিছুক্ষণ দেখে সে ফিরে যাবে নিশ্চয়. তার পর আমি খুঁজে নেব—'

অকস্মাৎ একটা অজানা ভয় যেন জিনতের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যায়।

একটা হাত তখনও ধরাই ছিল আনোয়ারের হাতে—তিনি সেটা টেনে নিয়ে দুহাত দিয়ে আনোয়ারের কাঁধটা চেপে ধরলেন—'সন্দেহ ক'রে যদি তোমার কোন অনিষ্ট করেন? যদি একেবারে বেঁধে রাখেন? আমি খবরও পাব না কিংবা কোন সাহায্যও করতে পারব না। তার চেয়ে তুমি আমার এই বুরখা পরে চলো—আমার ঘরে তোমাকে লুকিয়ে রাখব, যতদিন না তোমাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে পারি—'

এক রকম জোর করেই কাঁধ দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে কেমন যেন সেই আধলহমা সময়ের মধ্যে পাগল হয়ে উঠল আনোয়ার, স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গেল—দুহাত দিয়ে শাহ্জাদীকে জড়িয়ে একেবারে বুকে চেপে ধরে বলল, 'আমার এই মোনাজাত, এই ভিক্ষাটুকু দিন। আমার নিজের সব লাঞ্ছনা, সব কষ্ট সইবে কিন্তু আমার জন্যে যদি আপনার কোন বেইজ্জৎ হয় তাহলে আমি নিজেই নিজের জিন্দিগী খতম করব। খোদার নামে বলছি।'

---

* ইংরেজীতে যাকে Page বা Page boy বলে, ফার্সীতে হল পিশ-খিদমৎ। সাধারণত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদেরই এই কাজে নেওয়া হয়—রাজা বাদশাদের বা তাঁদের ছেলেদের পুত্রবধূদের ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে, সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। সব দেশেই এই রেওয়াজ ছিল। বড় জমিদার ঘরেও ১৬।১৭ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষদের রাখা চলত। কখনও কখনও, প্রাচীন কালে আরও বেশি, এদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কও স্থাপিত হত।

বলে আর দাঁড়াল না, বোধ করি নিজের দুঃসাহস ও বেআদবির পরিমাণ ততক্ষণে ওর মাথাতে গেছে, সেই অন্ধকারেই ছুটে চলে গেল—আন্দাজে বুঝলেন জিনৎউন্নিসা—ওর সেই নিভৃত স্থানটির দিকে। আনোয়ারও আজ রঙীন পাজামা আর কুর্তা পরে এসেছিল, ভাল ক'রে দেখাও গেল না তাই।

শাহ্জাদী অনেকক্ষণ সেখানেই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কী হল, কি ঘটল, কি বলে গেল ও, এই এক লহমার মধ্যে কত কি ঘটে গেল তাঁর জীবনে, ভাল ক'রে তা বুঝতেও পারলেন না।

বিহ্বল অভিভূত হয়ে গেছেন তিনি। সমস্ত শরীর একটা অপ্রত্যাশিত, অথচ বহুদিনের স্বপ্ন-দেখা সুখে থরথর ক'রে কাঁপছে, রিনরিন ক'রে উঠছে শিরা উপশিরা, মন মস্তিষ্ক।

ঈশ্বর কি তাঁর দুঃখেই কৃপা ক'রে তাঁর কোন তরুণ ফেরিশ্‌তা পাঠিয়েছেন—তাঁর আশা পূর্ণ করতে, সুখের পাত্র পূর্ণ ক'রে ভরে দিতে তাঁর মনে।

একদিন, কতটুকু মাত্র সময়ের পরিচয়—তাতে কোন মানুষ এমন মনের মধ্যে আসতে পারে, এমন ইশক্ অনুভব করে! করতে পারে!

এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে শাহ্জাদী জোর ক'রেই মনকে বাস্তবে নামিয়ে আনলেন। এমন চলাচলের পথে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। এত বড় প্রাসাদে কে কখন জেগে ওঠে—তার কোন স্থিরতা নেই। সম্রাটের এক মহিষী ওঠেন দিনের প্রথম প্রহর পার ক'রে, আর একজন—হিন্দু মহিষী—প্রত্যূষে উঠে তাঁর পূজা পাঠ সারেন গোপনে। স্বয়ং বাদশাই ভোরে ওঠেন—সুতরাং কিছু কিছু নৌকর, কানিজ, মাহারিনকে তো বাধ্য হয়েই উঠতে হয়।

সুতরাং এখান থেকে অবিলম্বে সরে কোন নিভৃত আবরিত স্থানে যাওয়া দরকার। একবার মনে হল যেমন এসেছেন তেমনি নিঃশব্দে

নিজের ঘরেই ফিরে যান। একা অন্ধকারে শুয়ে এই কিছু পূর্বের অভিজ্ঞতা—অভাবনীয় অকল্পনীয়—উপভোগ করেন সমস্ত মন দিয়ে দেহ দিয়ে। যে স্থানে আনোয়ারের স্পর্শ লেগে আছে তার প্রতিটি লোমকূপ অসহ সুখে কেমন যেন চিনচিন করছে, সেটাও অনুভব করা দরকার।

মনে হচ্ছে এ অনুভূতি আর কেউ, আর কখনও অনুভব করেনি। এমন সুখ আর আনন্দের রোমাঞ্চঘন মাধুর্য!

কিন্তু ভেতরে যেতে পারবেন না।

শরীর শিথিল হয়ে হয়েছে, পায়ে জোর নেই। একটু আড়ালে যাওয়াও দুঃসাধ্য, কষ্টকর।

তাছাড়া, আনোয়ার যে বলেছে ওঁকে খুঁজে নেবে। একটু পরেই তার ব্যায়াম শেষ হবে, সে আসবে সেই পরিশ্রম-রক্তিম মুখে, স্বেদ-মসৃণ দেহে। সে অবস্থায় ওকে স্পর্শ করা, ওকে দেখার আশা ছাড়তে পারবেন না।

ধীরে ধীরে প্রায়-অবশ দেহ টেনে নিয়ে শাহ্‌জাদী আর একটু ডাইনে গিয়ে বিরাট একটা বকুল আর গুলমোরের জোড়া গাছের আড়ালে ঘাসের ওপরেই বসে পড়লেন বকুলের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে।

এমনভাবে আর কখনও বসেছেন কি?

এই ঘাসের ওপর, অমসৃণ বৃক্ষকাণ্ডে গা ঠেসিয়ে?

না। কিন্তু এমন দিনও তো তাঁর জীবনে আসে নি কখনও।

এমন অত্যাশ্চর্য অনুভূতি।...

শ্রান্ত দেহে—তীব্র অনভ্যস্ত আবেগের সংঘাতে অবসন্ন ক্লান্ত—বসেই চোখ বুজেছিলেন। স্বপ্ন দেখতে চান তিনি, সদ্যলব্ধ সুখের স্বপ্ন। ঈশ্বরের করেজ, বেসুমর দান। আশ পুরিয়ে দিয়েছেন—তাঁর আজিজ প্রিয়তমকে পেয়েছেন তিনি ওঁর কুদরতে—

তন্দ্রা আসে নি, চোখ বুজেই ছিলেন, একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলেন এই সৌভাগ্য। সেই উপলব্ধিতে ডুবে ছিলেন, তাই কতটা সময় চলে গেছে বুঝতে পারেন নি। একেবারে খুব কাছে

একটা শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ পেয়ে—মৃদু, খুবই মৃদু, তবু তাঁর কান এড়ায় নি,—চমকে চোখ চেয়ে দেখলেন, তাঁরই আজিজ। তাঁর আনোয়ার।

আচ্ছা, ও কি ক'রে বুঝল তিনি ওর অনাবৃত পরিশ্রান্ত দেহই দেখতে চান। জামা পাজামা কিছুই গায়ে চড়ায় নি। সেই লঙ্গুটি পরেই চলে এসেছে। এমন তো আসার কথা নয়।

বুঝেছে বলেই, ওঁকে আনন্দ তৃপ্তি দিতে চায় বলেই, এইভাবে এসেছে।

তখন পূর্বাকাশে লালের আভা দেখা দিয়েছে—সেই লাল আলো এসে মিশেছে ওর সুগৌর ললাটের রক্তিমায়।

এত সুন্দর মানুষ হয়, হতে পারে!

অবাক হয়ে চেয়ে আছেন শাহ্জাদী—কিন্তু সে চেয়ে থাকার ভুল অর্থ করল আনোয়ার। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে আগে কুর্তাটাই গায়ে চড়াবার কৌশিস করতে গেল। শাহ্জাদী ওর হাত ধরে বাধা দিয়ে মুগ্ধ গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'থাক, আর একটু থাক আনোয়ার, বড় ভাল লাগছে।'

লাল হয়ে উঠল আনোয়ার, তবু তার মুখে চোখেও মুগ্ধতা—বিপুল এক বিস্ময় তার সঙ্গে।

ক্রীতদাসের মতো দেখেন ওদের প্রৌঢ়া রৌশনআরা বেগম, ব্যবহার করেন প্রয়োজন মতো, কিন্তু ভালবাসেন না।

বরং তুচ্ছ কারণে শাসন করেন। বন্দীর মতো কড়া পাহারায় রাখেন, ওদের ইহকালও নেই পরকালও নেই। যদি বা কোনদিন কাউকে মুক্তি দেন, তখন তার সমাজ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবার কোন পথ থাকবে না। বেশ্যার মতো, 'খানগী'র মতোই ঘৃণার চোখে দেখবে সবাই; বন্দীজীবনে দিন কাটিয়ে পরিশ্রম কি বিদ্যাচর্চায় কি যুদ্ধ করার অভ্যাস চলে যাবে। এ একরকম জীবন্ত সমাধিই ওদের।

আশ্চর্য, ইনিও তো শাহ্জাদী। তরুণী, সুন্দরী। অথচ কি আকুলতা, কি স্নেহ অপরিচিত একটা নাম-গোত্রহীন ছেলের জন্যে।

এ আকুলতা অভিনয় নয়—সেটা নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছে।

সত্য বলেই এমন মধুর ঝঙ্কার, ভালবাসায় এমন প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে ওর মনে।

তার চোখে যেন জল এসে গেল, কিছুপূর্বের মতোই আবেগে জ্ঞান বিবেচনা বোধ হারাল—দুহাতে শাহ্জাদীর হাত দুটো ধরে বলল, 'এত মেহেরবানি আপনার। আমার মতো এক সামান্য বান্দার প্রতি এত অনুগ্রহ। এ যে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

সেই হাত ধরার আকর্ষণেই যেন জিনৎউন্নিসা একেবারে ওর বুকের ওপর এলিয়ে পড়লেন, ওর গলায় মুখ গুঁজে বললেন, 'মেহেরবানি নয় আনোয়ার, মহব্বৎ। এ যখন আসে তখন এমনিই এসে পড়ে বানের জলের মতো—সব কিছু ভেঙে চুরে ভাসিয়ে। দিন ক্ষণ সময়ের হিসেব থাকে না এতে। কালই দেখেছি তোমাকে প্রথম, তবু মনে হচ্ছে তুমি আমার বহু যুগের পরিচিত, আমার সব থেকে আপনজন।'···

তারপর একটু থেমে যেন একটু নিশ্বাস নিয়ে আবারও বলেন, 'তুমি বান্দা বলছ নিজেকে, আমার মনে হচ্ছে তোমার বাঁদী হয়ে থাকার তুল্য সুখ আর কিছু হতে পারে না আমার জীবনে। চলো আনোয়ার, আমার যা কিছু আছে সব খরচ ক'রে লোকজনকে হাত ক'রে পালিয়ে যাই এখান থেকে। তুমি আমার আজিজ, আমার শৌহর, আমি তোমার জাওজা—এই আমাদের পরিচয় হোক। আমি তোমার সেবা করতে পারব এই আমার সব থেকে বড় সুখ, সব থেকে খুশ, নিশাত।'

বলতে বলতে আবেগে উত্তেজনায় তখনই যেন ওঠার চেষ্টা করল। পারল না আশিকের বাহুবন্ধনের জন্যেই।

হাসল আনোয়ার। এক হাতে শাহ্জাদীকে বুকে চেপে ধরে অন্য-হাতে তাঁর মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরে বলল, 'সে এ বাদশা-শালামতের জমানায় সম্ভব হবে না খুদাবন্দ্জাদী, লোকে বলে, এঁর

চোখ পাহাড়ের মধ্যে কি আছে দেখতে পায়; দরিয়ার নিচে কি ঘটছে তারও খবর রাখে। আমার কথা বাদ দিন, আমি পালালে বড় কোন হাঙ্গামা হবে না, ধরা পড়লে হয়ত আবার ফুকীজানের হাতে সঁপে দেবেন, তিনি যন্ত্রণা দিয়ে মারবেন—কিন্তু আপনার কথা আলাদা, শুনেছি আপনি তাঁর আদরের মেয়ে—মুন্নী শাহ্জাদী, এ দুনিয়ার যেখানেই আপনি থাকুন খুঁজে আনবেন, আর আমার এ গুস্তাকীর সাজা হবে হয়ত—আপনার সামনে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো।'

আলিঙ্গনের মধ্যেই শাহ্জাদী শিউরে উঠলেন, আনোয়ারের তা টের পেতে কোন অসুবিধা হল না।

জিনৎ জোর ক'রে মুখটা নামিয়ে ওর বুকে মুখটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'খুব—খুব দূরে যদি কোথাও যাই, জঙ্গলে কি উত্তরে কুমায়ুঁ পাহাড়ের কোথাও? এসব পোশাক ফেলে দিয়ে ভিখিরির মতো যাবো আমরা? তুমি ক্ষেতে খাটবে আমি তোমার গিরস্তী দেখবো, তোমার জন্যে চিলম তৈরী রাখব। তুমি জমিন থেকে এলে তোমার পা ধুইয়ে দেব—তুমি কোন কোন দিন তামুক পেতে দেরি হলে আমাকে লাথ মারবে—সেই আমাদের বেশ সুখে দিন চলে যাবে। আমার এ জহরৎ সোনা চাঁদিতে দরকার নেই, রেশম পশমেও না।'

আবারও হাসল আনোয়ার।

হাসি—কিন্তু সে খুশের হাসি নয়।

নিরুদ্ধ প্রেমের বেদনার সঙ্গে হতাশা মিশে বড় করুণ দেখাল সে হাসি।

এই সামান্য সময়ের মধ্যেই যেন আনোয়ারের বয়স বেড়ে গেছে, সে শাহ্জাদীর অভিভাবকত্বে উন্নীত হয়েছে।

'বড় বোকা তুমি মাহবুবা, লাইলি আমার, কিছুই জান না এ দুনিয়ার ধারা। আমার এ চেহারায় হয়ত মাটি মেখে চোখ এড়িয়ে যেতে পারি, তোমার এই জিল্লা, এই আশ্চর্য খুবসুরতি—তুমি ভিখিরি সেজে চাষীর মেয়ে সেজে যাবে! তাতে তো আরও সকলের চোখ পড়বে, তারা কানাকানি করবে এ নিয়ে। তা ছাড়া তোমাদের

ঘরের চাল-চলনই আলাদা—সেটা ঢাকবে কি ক'রে? হাঁটাই তো তোমাদের অভ্যাস নেই। তোমাকে হাঁটতে দেখলেই তো সকলে জেনে যাবে তুমি কোন্ ঘরের মেয়ে!'

বলতে বলতেই সংবিৎ ফেরে।

বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন সজাগ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ যেন একটা খোয়াব থেকে জেগে ওঠার মতোই গা ঝাড়া দিয়ে এবার সোজা হয় আনোয়ার, সযত্নে ও পরম স্নেহে জিনৎকেও সিধা ক'রে বসিয়ে দেয়। তার পর দ্রুত কুর্তাটা পরতে পরতে বলে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল কথায় কথায় হুজরৎকুম, সুরয উঠে পড়ল প্রায়। এমন বেহুঁশ হয়ে উঠলে ধরা পড়তে দেরি হবে না। আমার জন্যে ভাবি না—চিন্তা আপনার জন্যে। আপনার বেইজ্জতির জন্যে। আমার মতো একটা সামান্য ছোকরার সঙ্গে যদি আপনার নাম কেউ জড়ায়—সে আমার বড় বেশি লাগবে।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাজামা পরে নিয়ে বলে, 'আর এমন রোজ আসবেন না শাহ্জাদী, এমনভাবে চললে জানাজানি হতে বাধ্য।··· দু-চার দিন বাদ দেবেন। তারপর কোন দিন হয়ত খুব ভোরে—'

'না না,' ব্যাকুল হয়ে ওর বুকে একটা হাত দেন শাহ্জাদী, 'দু-চার দিন বাদ দিতে পারব না। তাহলে পাগল হয়ে যাবো। এই একটু দু-চার লহমার চোখের দেখা—এটায় আপত্তি ক'রো না আনোয়ার, এটুকু দয়া করো।'

আনোয়ারের গলা কেঁপে যায় আবারও।

কেঁপে ওঠে ওর সমস্ত দেহ।

'আমারই কি বাওরা দিওয়ানা হবার অবস্থা দেখছেন না। আমিই কি কাল সারা দিনরাত আপনার কথাই ভাবিনি, খোদাতাল্লার এই করুণার কথা? কিন্তু এই চোখের দেখাটাও যাতে বন্ধ না হয় এই জন্যেই হুঁশিয়ার থাকতে বলছি। যাক না দুটো দিন। আমি রোজই আসব—যদি না ঐ আর এক শাহ্জাদী কয়েদ

ক'রে রাখেন আমাকে, ঐখানেই কসরৎ করব। আপনি দু-তিন দিন পর আসবেন। তেমন ইচ্ছা হয় দূর থেকে দেখে নেবেন একবার।'

বলতে বলতেই ছুটে গিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শাহ্‌জাদীর গলা দিয়ে সতর্ক হওয়ার আগেই যে একটা কান্নার মতো শব্দ বেরিয়ে এল তা তার বোধহয় কানে গেল না।

॥ পাঁচ ॥

সারাদিন ধরে শাহ্জাদী অনেক ভাল ভাল প্রতিজ্ঞা করলেন।

আনোয়ার যা বলেছে, ঠিকই বলেছে, বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে। বিপদ ওঁদের দুজনকারই। রৌশনআরা বেগম অতি ভয়ানক লোক। তিনি কোন কিছুরই পরোয়া করেন না যেন। এক কালে সিংহাসন নিয়ে যখন শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের চার পুত্রই যুদ্ধে মেতে উঠেছিলেন তখন সাহিবাৎ-উজ্-জমানী জাহানারা বেগম স্বভাবতই পিতার প্রিয় এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকোর পক্ষ নিয়েছিলেন, কিন্তু রৌশনআরার বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি অপরিসীম—তিনি দারা বা সুজা কারও দিকে না গিয়ে আওরংজেব বা বর্তমান বাদশা আলমগীরকেই সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বাদশা সে ঋণ ভোলেন নি। তিনি প্রচুর অর্থ ও জহরৎ দিয়ে তো ভগ্নীকে তুষ্ট করেছিলেনই—তাঁকে হারেমের সর্বময়ী কর্ত্রী ক'রেও রেখেছিলেন।

কিন্তু এইখানেই রৌশনআরা থামতে পারেন নি। তিনি নিজেকে বাদশার স্রষ্টা এইভাবেই দেখতেন। বাদশা যখন হঠাৎ খুব গুরুতর পীড়িত হলেন তখন আবারও তিনি বলতে গেলে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন। ভাইজানের অবস্থা দেখে মনে হল এ যাত্রায় আর তাঁকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে না। সেক্ষেত্রে সুলতানৎ পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেওয়া কর্তব্য বলেই মনে করলেন। নিজামতের ওপর কড়া হুকুম গেল কোন জরুরী চিঠিপত্র বা হুকুমনামা যেন বেগমসাহেবাকে না জানিয়ে পাঠানো না হয়। বাইরের লোক আত্মীয়-স্বজন সকলের আসা বা দেখা করা বন্ধ হল, জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্জাদা মুআজ্জম (পরবর্তীকালে শাহ্আলম) দেখা করার অনুমতি পেলেন না, যদিও তাঁর তখন ষোল বছর বয়স হয়েছে। এমন কি প্রধানা বেগম, মুআজ্জমের মা নবাব বাঈ দেখা করতে এলে

রোশনআরা তাঁকে চুলের ঝুঁটি ধরে বার ক'রে দিলেন ঘর থেকে। পীড়িত স্বামীর বিরক্তির কারণ হবে বলে নবাব বাঈ নীরবে এ স্পর্ধা সহ্য করলেন। সেইসঙ্গে রোশনআরা সাহেবা বাদশার মুহর-ই সুলেমান [দলিল বা চিঠিপত্রে শীলমোহর করার আংটি, ইংরেজিতে যাকে Signet-ring বলে।] ও পাঞ্জা নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলেন।—নিজের বিশ্বস্ত একটি খোজা ছাড়া আর কারও বাদশার ঘরে যাওয়ার অধিকার রইল না।

তাতেই কি নিরস্ত রইলেন বেগম সাহেবা। তিনি তো ধরেই নিয়েছিলেন বাদশা আলমগীরের এন্তেকাল আসন্ন—সেই মতোই এধারে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন—সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে। মুআজ্জমই যদিচ জ্যেষ্ঠ উনি তাকে ডিঙিয়ে সমস্ত প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের, সেনাপতিদের, আশ্রিত ও করদ রাজাদের চিঠি পাঠালেন, যাতে তাঁরা বালক আজমকে ভাবী বাদশা হিসেবে সমর্থন ও তার তখৎ-এ-তাউস প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন। এমনও বললেন কাউকে কাউকে, বাদশা গতই হয়েছেন—গৃহযুদ্ধের ভয়ে সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে না।

একবারের রাজনীতিক খেলার দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন—সেটা তাঁর সহজাত এইটেই ধরে নিয়েছিলেন রোশনআরা।

আজমকে বাদশা করতে পারলে কয়েকটি মোহর ও কর্ত্রী পদবী নিয়ে তুষ্ট থাকতে হবে না। তিনিই প্রকৃত বাদশা হতে পারবেন।

এবং বাদশা-বেগম জাহানআরাকে পদানত না হোক যথেষ্ট অপদস্থ করতে পারবেন।

সেটাই তাঁর সব থেকে বড় উচ্চাশা। বড় রকমের প্রতিশোধও। তিনি সিংহাসন গ্রহণে সহায়তা করলেও আলমগীর জাহানআরাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন বেশী।

অবশ্য এত আয়োজনেও কোন ফল হয় নি। অনেকেই নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন ঘটনার গতি কোন দিকে যায় তা দেখার

জন্যে। কে জানে, বাদশা যা চতুর, এ হয়ত সবটাই মিথ্যা, অসুস্থতাটাও অভিনয়—তিনি শক্তিহীন হয়েছেন শুনে কার কি প্রতিক্রিয়া হয়, কেউ শাহ্‌জাহানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন কি না দেখার জন্যেই এই ছলনার জাল বিস্তার।

প্রকৃতপক্ষে আজমকে বসাবার জন্যে কেউই কোন মাথা-ব্যথা প্রকাশ করেন নি, সম্রাট শাহ্‌জাহানকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই কিছু কিছু গোপন সলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আব্বাজান শাহানশাহ্‌ আলমগীর সুস্থ হয়ে উঠে ভগ্নীর এই স্বেচ্ছাচারিতা ও বাদশাহীতে বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কৈ—কোন শাস্তি দেবার কথা তো তাঁর মনে আসে নি।

অথবা আলমগীরের কৃতজ্ঞতাটা মিথ্যা নয়। উপকারের মূল্য দিতে তিনি জানেন।

তার অর্থই হল, রোশনআরার এখনও প্রভূত প্রতাপ-প্রতিপত্তি বজায় আছে। তাঁকে ফাঁকি দিতে যাওয়া মানেই হল সিংহের গুহায় ঢুকে তার নাকে দড়ি পরাতে যাওয়া।

এ সবই জানতেন জিনৎউন্নিসা, সারা দিন ধরে সেই অভিজ্ঞতারই রোমন্থন করলেন, মনে মনে আনোয়ারের বাস্তববুদ্ধি ও হুঁশিয়ারীর হাজারো তারিফ করলেন। অনেকবার প্রতিজ্ঞা করলেন আপাতত দু-তিন দিন দূর থেকে দেখারও চেষ্টা করবেন না—ঐ কসরতের জায়গাটার কাছেই যাবেন না।

না, নিজের বিপদের কথা ভাবছেন না অত। রোশনআরা যত শক্তিই ধরুন—বাদশার স্নেহের মুন্নী বেগমের কোন অনিষ্ট করতে পারবেন না, বাদশা জীবিত থাকতে। চিন্তা আনোয়ারের জন্যেই। রোশনআরার ঈর্ষা অতি প্রবল,—প্রতিহিংসা-পিপাসা, নিষ্ঠুরতা তেমনি ভয়ঙ্কর।

এরা কেউই তাঁর ভালবাসার পাত্র নয়—এই সব ছেলেগুলো। রোশনআরা নিজেকে ছাড়া কাউকে ভাল বাসেন না। যেমন

ক্ষমতার পিপাসা, তেমনি কামচরিতার্থ করারও। বরং বেশি, সম্ভোগে তাঁর যেন তৃপ্তি হয় না। নূতন নূতন তরুণ যুবা, নূতন নূতন পদ্ধতি তাদের উপভোগ করার।

শয়তানী বললেও ঠিক বোঝানো যায় না।

সব দিক দিয়েই সাক্ষাৎ দানবী একটি।

হিন্দুরা যাকে পিশাচী বলে তাই।

আনোয়ার দশজনের একটি, কিন্তু যদি তিনি শোনেন যে অন্য স্ত্রীলোকে সে আসক্ত হয়েছে—তাহলে তাকে সম্ভোগ করার পরিবর্তে কঠিনতম নির্মমতম শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ-তৃষ্ণা চরিতার্থ ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।

না, আনোয়ারের জন্যেই সতর্ক থাকতে হবে।...

কিন্তু দিনের স্থির বুদ্ধি, বিবেচনা, যুক্তি, সতর্কতা—সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ দিগন্তে মিলিয়ে যায়। আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে আসে আবেগ। নিশীথ রাত্রি আনে উন্মত্ততা, ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীন, স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবহীন বেপরোয়া মনোভাব।

তার আশিক তার আজিজকে যদি একবারও পেত, এক রাত্রি কেন এক দণ্ডের জন্যও—যাকে সত্যকার পাওয়া বলে—পারত তার যৌবন-কঠিন আলিঙ্গনে পিষ্ট হতে, তার প্রচণ্ড ক্ষুধার শিকার হতে—তাহলে সে আর কিছু চাইত না—এ জন্মের মতো এ ভোগ পিপাসা বিসর্জন দিয়ে শুধু ঈশ্বরের নাম ক'রে জিন্দিগী কাটিয়ে দিত।

এ কামনা এ কল্পনা শুধুই খোয়াব—বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়, তা শাহ্জাদীও জানেন। তবু সেই স্বপ্ন দেখাতেই সমস্ত শরীর উত্তেজিত মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস মাত্র নামে না। শুধুই এপাশ ওপাশ করেন, অন্যদিন শেষের দিকে তবু একটু আচ্ছন্নতা আসে, আজ তাও এল না।

এ এক অননুভূত যন্ত্রণা।

সর্বাধিক সুখের ও সার্থকতার চিন্তাতেও এমন শারীরিক যন্ত্রণা হয়? আশ্চর্য!

শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলিয়ার বড় পেটা-ঘড়িতে চৌকিদারের হাতুড়ির ঘা পড়ল—গুণলেন মনে মনে, চার ঘা—অর্থাৎ শেষ রাত্রের চার ঘড়ি বাজল।

আর শুয়ে থাকতে পারলেন না জিনৎউন্নিসা। আগের দিনের সেই গাঢ় সবুজ রঙের বুরখাটা গায়ে চড়িয়ে—কী ভেবে আর একটা বুরখা হাতে নিয়ে—আগের দিনের মতোই নিঃশব্দে তাতারিণী ও খোজাদের তন্দ্রাতুর দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর মহল থেকে—তেমনি ভাবেই হারেমের বড় দরওয়াজা পেরিয়ে।

আর কালকের মতোই—যেন বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের খানিকটা ছায়ামূর্তির আকার নিয়ে কে সামনে এসে দাঁড়াল।

আজ আর ভয় পেলেন না। চিনতেও অসুবিধে হল না।

মনটা অকস্মাৎ যেন শঙ্কাহীন নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

যে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল, তারই বুদ্ধি বিবেচনা যদি এই মহব্বতে ভেসে যেতে পারে—ওঁরই বা কি লাভ সে চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে থেকে।

যা হবার হোক, যা তকদিরে আছে তা কেউ বদলাতে পারবে না। নসিব তো আসলে খোদাতায়ালারই নির্দেশে লেখা হয় মানুষের জন্মের সঙ্গে—তার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া মানে নিজেরই নির্বুদ্ধিতা, ভাগ্যের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া।

শাহ্জাদী চোখের নিমেষে নিজের বুরখার ভেতর থেকে অপর বুরখাটি বার ক'রে মাথা দিয়ে গলিয়ে দিলেন আনোয়ারের, তারপর ওর হাত ধরে আকর্ষণ করলেন অন্তঃপুরের দিকে—

দুজনেরই নিয়তির দিকে—অন্ধকার, ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

সাবধানে সন্তর্পণে—প্রহরিণীদের সতর্কতা এড়িয়ে—নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন শাহ্জাদী।

আনোয়ারও আর বাধা দিল না, কিছু বলবার চেষ্টা করল না।

সেও বুঝি আর পারছে না নিজের মনটার সঙ্গে লড়াই করতে।

এত কাণ্ড করার থেকে ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করাই তো ভাল। যা হবার হবে। আপাতত এই দুদণ্ডের সুখ, এইটুকু আনন্দ, এই থাক না সত্য হয়ে—জিন্দিগীকে সার্থক ক'রে।

অন্ধের মতোই সে যেন তার অন্তরের আলোকদূতীকে অনুসরণ করল—নীরবে, নিঃশব্দে, বিনাপ্রতিবাদে।

এ আকর্ষণ যে তার সর্বনাশেরই, তাও বোঝবার কি ভাববার চেষ্টা করল না।

সব ভাবনা সব সতর্কতা সব শুভ বুদ্ধি থাক ভবিষ্যতের জন্যে—এই রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কথা আর ভাববে না আনোয়ার।

তার পরের কথা দুজনেরই সচেতনতা বা অনুভূতির অগোচর।

কী হল তা কে জানে। যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে দুজনের জীবন নিয়তির উপকূলে আছড়ে পড়ল।

তবু তার আগে সেই আবর্তের শীর্ষে উঠেছিল বৈকি।

কিন্তু ঠিক কি হয়েছিল, কতটা উঠেছিল তা কেউ বুঝতে পারে নি, অথবা—জানা বা বোঝা বুঝি সম্ভব নয়। সে দুদণ্ডের ইতিহাস দিন মাস বৎসর বা যুগ নয়—সে বুঝি যুগযুগান্তরের ইতিহাস। তা বুঝে ভেবে মনে ক'রে লিখতে হলে বহু, বহু বৎসর কেটে যাবে।

স্বপ্নসাধ মিটেছিল বৈকি। অক্ষরে অক্ষরে, বিন্দুতে বিন্দুতে—মিলিয়ে পেয়েছিলেন শাহ্‌জাদী।

সেই আবেগ, সেই প্রণয়—সেই যৌবনদৃপ্ত দৃঢ়াঙ্গ বক্ষে, কঠিনতম অথচ পরম সুখদ বাহুবন্ধনে পিষ্ট হওয়া।

সেই সর্বাঙ্গে অজস্র চুম্বন।

এ সব কি সত্য ?

না কি কোন অবাস্তব খোয়াব।

কোন কুহকীর ইন্দ্রজাল। সবটাই এক জাদুর খেলা !

তা হোক—সে অনুভূতি তো সে উপভোগ করতে পারছে। জীবনের বোধ করি সর্বাপেক্ষা প্রেয় সেই অনুভূতি!

মনে হয়েছিল, প্রার্থনা করেছিল, সে প্রণয়লীলার শেষ না হয়, সমাপ্তি না ঘটে। হে ভগবান।

কিন্তু সমাপ্তিই সৃষ্টিলীলার সবচেয়ে বড় তত্ত্ব।

আনন্দ সুখ জীবন স্বপ্ন—সবেরই অবসান ঘটে একদিন। ঘটে বলেই বুঝি তার এত মূল্য।

শুরু আর শেষ, একসঙ্গে গাঁথা মানুষের জীবনমাল্য।......

তাই, এ পরম রজনীরও শেষ হল এক সময়।

পূর্বদিকের ঝরোখার স্ফটিক-আবরণীতে প্রথম উষার আভাস এসে লাগল।

সে আলোর আঘাতে, রূঢ় বাস্তব প্রতিভাত হ'ল ওদের জীবনে বা ভাগ্যে।

অর্থাৎ খোয়াবের, স্বপ্নের রাত্রি শেষ হল।

দিওয়ানাগির আবেগের পালা খতম।

এবার আখেরি হিসাবের পালা।

দুজনেই দুজনার বস্ত্রাদি সম্বৃত ক'রে স্থির হয়ে বসলেন।

শাহ্‌জাদী এবার আর কোন বাধা মানলেন না—না সঙ্কোচের না সংস্কারের। আনোয়ারের পায়ের কাছে বসে দুটি পা নিজের কোলে তুলে নিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এখনও সময় আছে। চলো আমরা নৌকর নৌকরনীর পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ি, গভীর জঙ্গলে কি দূর দেশে কোথাও—হাঁটা পথে যাবো, বাদশার সিপাহী খোঁজ পাবে না। তুমি পারো খেতিউতি করো—না হয় তো চুপ ক'রে বসে থেকো, আমি তোমার গিরস্তি দেখব, দুজনের মতো কিছু ফসল ক'রে নেবো—তোমার সেবা করব। সেই আমার সবচেয়ে বড় খুররমী, বড় নিশাত। সেই পাতার ঘর আর চাষের মতো একটু জমি—আমাদের সুলতানৎ।

পায়ের কাছ থেকে টেনে আবারও বুকের কাছে আনে আনোয়ার, গালে নিজের কপালটা চেপে ধরে বলে, 'শাহ্জাদী সাহেবা, শারীরিক পরিশ্রম যে কি সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। গত দুশো বছরের মধ্যে তোমাদের বংশে কেউ কোন দুঃখ ভোগ করে নি, শরীর খাটিয়ে খাওয়া কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। আমি বাদশা সুলতানের ঘরে জন্মাই নি, তবু জমির চাষ কি ক'রে করতে হয়, কিভাবে গেঁহু পিষতে হয়—তা জানি না। আমাদের সঙ্গে আপনার তুলনাই হয় না, তবু খেটে খাবার অবস্থা আমারও ছিল না। কিন্তু সে তো পরের কথা। হাঁটতেই পারবে না—চাষী কি নৌকরের পোশাক পরবে? কিন্তু আমাদের চালচলন কদম ফেলা দেখেই সবাই বুঝবে, আমরা বান্দা নফর নই। না পিয়ারী, এসব ছেলেমানুষী করতে যেয়ো না—আমাকে বাঁচাতে তো পারবেই না, তুমিও বাদশার বিষ নজরে পড়বে। একথা জানাজানি হলে, কি আমরা ধরা পড়লে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাদশার মাথা হেঁট হবে—তাঁর হারেম লোকের ঠাট্টাতামাশার ব্যাপার হয়ে উঠবে। শাহানশাহ্—যতদূর শুনেছি যতটা বুদ্ধিমান, ততটাই ক্রোধী, আর প্রতিশোধ-পরায়ণ। তিনি এ অপমান অসম্ভ্রম কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।'

একটু থেমে আবার বলে, 'এই যা পেলাম আমার জান আর জিন্দিগী সার্থক সফল হয়ে গেল। না আজিজা, এরপর তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফোটাও আমার সহ্য হবে না, তোমার কোন অনিষ্ট হতে পারে—এ চিন্তাও আমি করতে পারব না। তার আগে আমি দশ বার মরতে রাজী আছি। মৌত-ই-ফাজ্রতও আমার কাছে তোমার বেইজ্জতীর থেকে শতগুণে মুস্তাক।'

আবারও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

আবেগে প্রেমে দয়িতার বিপদাশঙ্কার সম্ভাবনায়।

চোখ দিয়ে জল পড়ে না—তাকে বন্ধ করতে গিয়ে চোখ লাল হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম শিরাগুলো স্পষ্টতর হয়।

আবারও বলে, 'তার চেয়ে আজকের এই স্মৃতি ইয়াদ্-জিকর

নিয়ে মরি—সেই তো ভাল পিয়ারী, অনেক ভাল। তকদিরে থাকে, আল্লার মেহেরবানি হয়, বেঁচে থাকব, তোমার আমার মিলনও হয়ত অসম্ভব হবে না। খোদার কুদরতে কি না হয়। নইলে এইটুকু জেনো—যা পেয়েছি আমার বুকের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে, তোমার এ দয়া—যদি বাঁচি, যতদিন বাঁচব মনে থাকবে।'

কিন্তু আর সময় নেই।

আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঘরের মধ্যেও।

আনোয়ার এবার উঠে দাঁড়ায় একেবারে—জিনতের দুহাতের বন্ধন-আলিঙ্গন আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'আর না, এই হয়ত বড্ড দেরি হয়ে গেল। যাই এবার। মৌখিক শোকর গুজারিতে তোমার অপমানই হবে, তুমি দুহাত ভরে ঢেলে দিয়েছ তোমার মহব্বৎ। শুধু যাবার আগে একটা মোনাজাত জানিয়ে যাই, এতটা পেয়েছি বলেই এত সাহস—মোনাজাত কেন তোমার কাছে এটা আমার ভিক্ষা, লুৎফ্—দেবে তো?'

মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন শাহ্জাদী—এই বিচ্ছেদের কথাটা বুঝি তখনও উপলব্ধি করতে পারেন নি, বললেন, 'নিশ্চয়ই দেব, যা সাধ্য যতটা সাধ্য—জান দিতে হয় তাও দেব—বল কি চাও। আমি কথা দিচ্ছি।'

'জানের কথাই। তোমার জান নয়। যদি—শোন রৌশনআরা বেগম সাহেবা আমাকে কয়েদ করেছেন, আমার ওপর নারাজ হয়েছেন—আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করার কোন উপায় নেই, যেমন ক'রে হোক—তুমি গিয়ে নিজে হাতে আমার বুকে কি পিঠে ছোরা কি কিরীচ বসিয়ে দিও। তিনি যে কি পৈশাচিক প্রতিশোধ নেবেন—কী যন্ত্রণা দেবেন ভেবে ভেবে—তা তুমি ভাবতেও পারবে না। সে অমানুষিক জাহান্নামী অত্যাচার থেকে, নিষ্ঠুরতা থেকে আমায় উদ্ধার ক'রো। যদি মরতেই হয় যেন তোমার হাতে মরতে পারি, সেই আমার বেহেস্তী সুখ।'

আর দাঁড়াল না আনোয়ার, জিনতের উত্তরের অপেক্ষা করল

না। উত্তর দিতে পারবেন না তা আনোয়ার বুঝেছিল সেই আকুলতা এড়াতেই দ্রুত বুরখাটা মাথায় গলিয়ে বাইরের আধো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাতেই বড় বেশী দেরি হয়ে গেল বোধ হয়।

বাইরের সোনালী আলোর দিকে চেয়ে নিজের অতলান্ত দুঃখের মধ্যেও মনে হল শাহ্জাদীর।

॥ ছয় ॥

বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে সত্যিই—তা প্রায় এক লহমার মধ্যেই টের পেলেন জিনৎউন্নিসা।

আনোয়ারের আবছা অস্তিত্বটা চোখের আড়ালে যাওয়া মাত্র কি একটা শব্দ হল বাইরে।

ওঁহুই এই মহলের বাইরে, খুব কাছে।

অনভ্যস্ত শব্দ একটা, অপরিচিত।

ভারী পর্দার মধ্যে দিয়ে এ ঘরের ভিতর শব্দই আসে কম। তবু যেটুকু আসে—ধীরে ধীরে এই প্রাসাদপুরীর অধিবাসিনীদের ঘুম ভাঙার শব্দ, নানাবিধ চিহ্ন,—এ তো সে রকম নয়।

যেন কে বা কারা একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বা আঘাত করল কাউকে। শব্দটা খুব জোর নয়—তবু জিনতের কানে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন বাদশাজাদী। তিনিও সেই গাঢ় রঙের বুরখাটা গায়ে গলাতে গলাতেই একরকম ছুটে বাইরে এলেন।

কিন্তু—কৈ না। কেউ তো কোথাও নেই। তাঁর মহল, মহলের বাইরে অন্য বেগম সাহেবাদের মহল—কোথাও তো কারও জাগরণের কোন লক্ষণ নেই। নীরব নিথর এই বিশাল ঘুমন্ত পুরী।

তবে কি তিনি ভুল শুনেছেন? অজানা অমঙ্গল-আশঙ্কায় কল্পনা করলেন শব্দটা।

অয় খোদা! তাই যেন হয়।

তিনি ধীরে ধীরে ফিরে এলেন ঘরে।

একি তাঁর চির পরিচিত আবাস? এই ঘর?

ঘরের গঠন ঠিকই আছে হয়ত, তবু সে ঘর নয়।

কিছু পূর্বের সুখস্মৃতি তখনও যেন সে ঘরের আসবাবে শয্যায় পর্দায় লেগে আছে। যেন তার একটা সুরভি পাচ্ছেন তিনি।

আনোয়ারের দেহের গন্ধ? হে ঈশ্বর, এ গন্ধ যেন না যায়—বহুক্ষণ থাকে, বহুদিন, বহু বৎসর, ওঁর জিন্দিগী ভর।

বিচ্ছেদ বা বিরহ—এইবার একটু একটু ক'রে ধারণার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখস্বপ্ন থেকে, বেহেশ্‌তি খোয়াব থেকে এক লহমায় বাস্তবে নেমে আসা যায় না। এইবার নামছেন, কঠিন বন্ধুর এ পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনে।

নির্মম নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর জীবনারণ্যে।

অনুভূতিটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বুকের মধ্যেটা পিষে গেল এক অননুভূতপূর্ব যন্ত্রণায়।

এমন কখনও এর আগে ওঁর হয় নি।

শারীরিক অসহ্য কষ্ট, তবু তার মধ্যেই কোথায় একটা প্রিয়-মিলনাস্বাদের সুখস্মৃতিও জড়িয়ে আছে।

যা পেয়েছিলেন তা নেই, হয়ত আর কোনদিনই পাবেন না—সেই ভেবেই তো এই যন্ত্রণা। সেই পরম পাওয়ার অভিজ্ঞতাটাও যে কাজ করছে সে স্মৃতি ও চিন্তার সঙ্গে।

দু হাতে বুকটা চেপে ধরে বিছানাতেই বসে পড়েছিলেন জিনৎ। হয়ত অজ্ঞানই হয়ে পড়তেন কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার একটা শব্দ পেলেন। খুবই মৃদু, তবে ঘরের খুব কাছে বলেই তা আচ্ছন্নতার মধ্যেও কানে গেল।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ভেলভেটের ভারী পর্দাটা সরিয়ে কুরনিশ করতে করতে ঘরে ঢুকল ওঁর খাশ বাঁদী একজন—রুকেয়া।

চমকে উঠলেন জিনৎ।

আবারও সেই অজানা আতঙ্ক একটা। বুকের মধ্যে যেন একটা প্রবল কম্পন অনুভব করলেন।

তবু তিনি শাহ্‌জাদীই, সম্রাটের পৌত্রী সম্রাটের দুহিতা—বোধ করি এক লহমার মধ্যেই নিজেকে স্ব-স্বভাবে ফিরিয়ে আনলেন।

স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও আলস্যের সুরে প্রশ্ন করলেন, 'কী রে, আজ এত সকালে উঠেছিস যে!'

ঈষৎ একটু মুচকি হাসির সঙ্গে রুকেয়া বলল, 'আমরা তো কেনা বাঁদী হজরৎ বেগম সাহেবা, আপনাদের মর্জি কি খুশির জন্যে হামেহাল তৈয়ার থাকব, এই তো আমাদের কাজ। আপনি আজকাল সুবাহ সুবাহ উঠে পড়ছেন—কাজেই আমাদেরও ফজিরে ওঠা উচিত। বলা তো যায় না, যদি কিছু হুকুম হয়।'

আবারও সেই আশঙ্কার আভাস। বুকের মধ্যে গুর-গুরুনি।

মুখটা কি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে? ঐ শয়তানী বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কেন অমন ক'রে?

তবে ওঁকে কথা বলার দায় থেকে অব্যাহতি দিল রুকেয়াই। হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ইস, আপনার বিস্তারা এমন লণ্ডভণ্ড করল কে? যেন কে লড়াই চালিয়েছে ওর ওপর। রাতে ঘুম আসে নি বুঝি শাহ্জাদী বেগম সাহেবার। তবিয়ৎ খারাপ নাকি?'

বাবুর-তৈমুরের রক্ত কাজ করবে বৈকি।

মুহূর্ত-মধ্যে কঠিন হয়ে উঠল মুখ, শাহ্জাদী শাণিত তপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে তোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি? এত আত্মীয়তা করার আস্পর্ধাটা কোথা থেকে এল? অনেকদিন খোজা নুরুদ্দীনের চাবুক খাও নি, না। লাথি মেরে ঐ মুখ গুঁড়িয়ে দিতে পারি, তবে তাতে আমার পায়েরই বেইজ্জৎ।'

এবার মুখ বিবর্ণ হওয়ার পালা বাঁদী রুকেয়ার। সে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে শুরু করল, কোন মতে কুর্নিশ করতে করতেই ঘর থেকে পালিয়ে গেল। যে বিজয়গর্ব ও কৌতুক তার দুই চোখের কোণে ঝক্ঝক করছিল—তার আর চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

কিন্তু এ তো গেল ছদ্মবেশ, অভিনয়।

তবে এর জন্যে কোন কোশিস করার প্রয়োজন হয় না।

সম্রাট-বংশের অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, এঁদের রক্তে মিশে আছে শাসকের মনোভাব, মর্যাদা রক্ষার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর নিয়েই বোধ করি এঁরা জন্মগ্রহণ করেন। ইচ্ছামাত্র ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করা এঁদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

কিন্তু বুকের মধ্যে সেই দুশ্চিন্তার তুফান, হিম হিম ভাব অত সহজে গেল না।

স্বভাব বা অভ্যাস যতই পুরাতন হোক, দেহের ধর্ম সকলকেই পালন করতে হয়।

কিছু কিছু ঘটনা এমন ঘটে, যার জন্যে মানসিক কোন প্রস্তুতি থাকে না।

নতুন আকস্মিক ঘটনায় বুক কাঁপবে বৈকি।

এটা ওঁর কাছে নতুন, এ পরিস্থিতি কখনও দেখা দেয় নি জীবনে। মহব্বৎ ইশ্‌ক—এ জীবনে এই প্রথম। কাজেই এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীজড়িত যে সমস্যা জটিলতা আশঙ্কা—তার কোনটাই বোধ করেন নি এর পূর্বে।

আশঙ্কাও নূতন। বিশেষ এই পায়ের নিচে পড়ে থাকা দাস-দাসীদের ভয় করা।

এখন মনে হচ্ছে, এরা সব জানে, প্রথম থেকেই জেনেছে। এরা লক্ষ্য রাখছে ওঁর ওপর সেই প্রথম দিন থেকেই। এই কদিনই রাখছে।

একবার মনে হল, জানুক না। কী ক্ষতি করতে পারবে ওঁর?

কুমারী বাদশাজাদীদের পুরুষ-সঙ্গ-পিপাসা নতুন নয়। বাদশারা টের পেলে—এদের গ্রাম্য ভাষায়—কুকুর মারেন, হাঁড়ি ত্যাগ করেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই, দুঃসহ দুঃখে বুকটা যেন পিষে গেল আবার—মনে পড়ল অনিষ্ট করতে পারে আনোয়ারের। এই কাহিনী ফুফীজানের কানে গেলে তিনি রাক্ষসীমূর্তি ধারণ করবেন। ফুফীকে এটুকু ভাল ক'রেই জানেন জিনৎ। স্বার্থপর। আত্মসুখসর্বস্ব। ভাইঝির ওপর শোধ তুলতে পারবেন না বলে—দুজনের দুষ্কৃতির প্রতিশোধ

নেবেন একজনকে অমানুষিক পীড়ন ক'রে, নারকীয় যন্ত্রণা দিয়ে। দুজখ্‌-এর আগুন ওঁর বুকে—সেই আগুনে পুড়িয়ে মারবেন।

নূতন নূতন পীড়নের উপায় উদ্ভাবন করবেন—যন্ত্রণা দেবার নব নব যন্ত্র।

আনোয়ার বোধহয় বুঝেছিল, আন্দাজ করেছিল।

ওর কথার মধ্যে সে আভাস দিয়েও ছিল, নিজের নূতন প্রণয়-মিলনের অভিজ্ঞতায় বিভোর জিনৎ তা বোঝার চেষ্টাও করেন নি।

আনোয়ার জেনেই এসেছিল, মৃত্যুর সম্ভাবনা তুচ্ছ ক'রে—এই মহব্বৎটুকু ভিক্ষা দিতে। প্রাণ দেহ পূর্ণ করে, ওঁর তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে সে—মিলন সুধায়, বোধ হয় নিজের জান আর জিন্দিগী দিয়ে।

হায়, তিনি যদি আর একটু সতর্ক হতেন, আর একটু সংযত। ঐ মহাপ্রাণ ছেলেটার প্রাণ হয়ত এমনভাবে যেত না।···

আবার মনে হয়—এসবই ওঁর কল্পনা নয় তো ?

বাঁদীর সাধারণ কৌতুকের চেষ্টাকে তিনিই হয়ত এত ভয়াবহ ক'রে দেখছেন।

বিপদের সমুদ্রে সামান্য তৃণখণ্ডকেও অবলম্বন করার চেষ্টা করে মানুষ।

এও সেই রকম আশ্বাস পাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

কিছুই স্থির হয় না, কিছুই জানতে পারেন না নিশ্চিত ক'রে ?

আশা নিরাশায় আশঙ্কা ও আশ্বাসে সারাটা দিন ছটফট করেন শুধু। আহার্য মুখে রোচে না, প্রসাধনে বিরক্তি আসে, এমন কি গুসল করতেও ইচ্ছা করে না।

প্রভাতে যা মনে হয়েছিল মধুরতম সুখস্বপ্ন, অপার্থিব অভিজ্ঞতা—এই দিবাশেষে বিভীষিকার কারণ হয়ে ওঠে। থরে থরে আনন্দের উপকরণ সজ্জিত ছিল তখন, মনে হয়েছিল ফেরিস্তা জিব্রাইল ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ অমৃত বয়ে এনেছেন—প্রকৃতির অফুরন্ত দিকদিশা-

পূর্ণ করা সৌন্দর্য-নৈবেদ্যের পিছনে তাঁরই অশরীরী-উপস্থিতি বুঝি—এখন মনে হচ্ছে দুজখ্ থেকে শয়তানও এসেছিল তাঁর সঙ্গে, তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করতে।

শয্যা তেমনিই অপরিষ্কার থাকে, বস্ত্রাদি তেমনি মলিন।

শুধুই ক্লান্তি নয়, বোধ হয় ঈপ্সাও ছিল কিছু।

এ শয্যায় এখনও তার স্পর্শ, এ পরিচ্ছদেও তার হাতের ছোঁয়া।

দুটি চক্ষুই আরক্ত হয়ে উঠেছে—দুদিনের অনিদ্রায়, দুর্ভাবনায় আর উদ্‌গত অশ্রুদমনের প্রাণপণ চেষ্টায়। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, অসহায়।

দাসীরা কারণে অকারণে আসছে, আবার তাঁর মূর্তি দেখে পিছিয়ে যাচ্ছে।

রুকেয়ার অভিজ্ঞতা তারাও শুনেছে বৈকি।

শেষে একেবারে রাত্রে যেন কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন জিনৎ।

যদিই এসব ভয় মিথ্যা হয়, যদি তাঁর আজিজ নিয়মিত সময়ে আসে সেই কসরতের নিভৃত নিকুঞ্জে—এই অবস্থায় ওঁকে দেখলে কি স্বপ্নভঙ্গ হবে না তার?

হয়ত, হয়ত ঘৃণাই হবে। এমন কি হয়ত প্রণয় ভিক্ষা দিতেও ইচ্ছা করবে না।

তিনি জোর ক'রে গুসল করলেন। প্রসাধনও করলেন কিছু কিছু। শরবত আর কিছু ফলও খেলেন, তারপর একটু ঘুমিয়ে নেবারও চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বিছানায় শোওয়া মাত্র মনে পড়ল এই বিছানায় তাঁর প্রিয়তমের দেহের গন্ধ হয়ত এখনও লেগে আছে, তার ঘামে ভিজে ছিল—তারও স্মৃতি কি কিছু পাওয়া যাবে না? তিনি প্রাণপণে রেশমী আস্তরণ জড়ো ক'রে তাতে মুখ গুঁজে সেই গন্ধ সেই স্মৃতি অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাকিয়াটা শুঁকে শুঁকে দেখতে লাগলেন বারবার, কোন গন্ধের আভাস পাওয়া যায় কি না—ফলে চোখের ধারে কাছেও নিদ্রার আভাস নামল না। আরও একটি রাত্রি সম্পূর্ণ বিনিদ্রই কাটল তাঁর।

পূর্বদিনের মতো অন্ধকার শেষ-রাত্রে নয়, প্রথম দিনের মতো প্রত্যূষ কালেই বেরিয়ে পড়লেন নির্মল বাতাস আর অসংখ্য ফুলের মিলিত সৌরভের আশায়।

সহজভাবেই বাইরে এলেন। কেউ যদি দেখে তো দেখুক।

গোপনের চেষ্টা দেখলেই সন্দেহ দেখা দেবে—নানারকম সন্দেহ ও কদর্য অনুমান।

উনি এমনিই বেড়িয়ে বেড়াবেন, যেন ফুল ফুলের গাছ আর ঘাস অনুভব করতে করতে কাছে যাবেন, দূর থেকে দেখে চলে আসবেন। আনোয়ার এলেও তিনি ধারে কাছে যাবেন না। সহজভাবেই আরও খানিকটা বেড়িয়ে তাঁর মহলে ফিরবেন।

মনে কামনা যতই উদ্বেল আর দুর্বার হোক, তার সঙ্গে কথা বলার কি একটুকু স্পর্শ লাভের জন্য যতই উদগ্রীব হোক—সে দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না।

দেবেন না আনোয়ারের জন্যেই।

উনি উদাসীন ভাবে বেড়িয়ে ফিরে এলে আনোয়ারের বিপদের সম্ভাবনাও কমবে কিছু। ওপক্ষের গোয়েন্দারাও—যদি সে ব্যবস্থা থাকে নিরাশ হবে।

কিন্তু অবাধ্য পা দুটোর বুঝি অপেক্ষা সয় না, অনেক ঘুরে অনেক পরে যেদিকে যাবার সঙ্কল্প ছিল—সেদিকেই আগে নিয়ে গেল তাঁকে। সেই চামেলি বিতানের কাছে।

প্রথম দর্শনের সেই স্থানটিতে।

না, কেউ নেই।

তবুও হতাশ হন না শাহ্জাদী।

প্রাণপণে, নিজের গরজেই কোন আশা বা আশ্বাস পাবার প্রয়াস পান।

হয়ত পরে আসবে, ইচ্ছে ক'রেই সময় পালটেছে। একটু এদিক ওদিক ঘুরলেন, ঘাসের ওপর একটু বসারও চেষ্টা করলেন—তবে সে ওঁর মতে দীর্ঘকাল হলেও, আসলে অতি সামান্য মাত্র সময়।

ওঠেন, আবারও কাছে যান সেই স্থানটির।

কেউ নেই। উষার আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার অরুণাভা নবীন কিলার লালপাথর প্রতিবিম্বিত আরও বেশি রক্তাভ দেখাচ্ছে। এখন বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়—আনোয়ারের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

শাহ্জাদী পাগলের মতো ছুটে গিয়ে হেঁট হয়ে ঘাসগুলো দেখলেন ভাল ক'রে—পায়ের চাপে কিছু দলিত বোধ হচ্ছে কি না—দেখলেন তেমন কোন চিহ্ন নেই। গতকালও এখানে আসার সময় মেলেনি নিশ্চয়—ঘাসের ডগা বেশ সতেজ ও সুস্থ দেখাচ্ছে। যেখানে পোশাক ছাড়ে সেখানেও গেলেন—কোন আশা নেই জেনেও।

না, আসে নি আজ। আর আসবেও না, সে সময় চলে গেছে।

তবু কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সেখানেই অপেক্ষা করলেন।

শেষে দিনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর থাকা যায় না।

সামান্য ভৃত্যস্থানীয় পুরুষের নজরে পড়বার মতো অমর্যাদা বাদশাজাদীদের আর কিছু হতে পারে না।

শাহানশাহ্ টের পেলে ক্রুদ্ধ হবেন।

অগত্যা মাতালের মতো টলতে টলতে আবার নিজের মহলেই ফিরে গেলেন।

এই বয়সেই বুকটা এমন শূন্য বোধ হবে, জীবন এমন বিস্বাদ—তা কে ভেবেছিল।

॥ সাত ॥

দুঃসহ আরও একটি দিন কাটল।

দিন এবং রাত্রি। আর প্রতিটি লহমা কল্পনাতীত এক দৈহিক যন্ত্রণার ইতিহাস, প্রতিটি নিমেষ অব্যক্ত রোদনে ব্যথাতুর।

রাত্রি শেষের অস্থিরতা তেমনিই অসহ্য।

আবারও শূন্য উদ্যানে অভিসার যাত্রা।

আবারও সেই প্রথম প্রভাতের মতো নিষ্ফল প্রয়াস।

শূন্যতা ও ব্যর্থতা।

আনোয়ারের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও।

সে জায়গায় ঘাসগুলো আরও সতেজ হয়ে উঠেছে। আঘাতের ক্ষত নিরাময় করেছে প্রকৃতি।

যে ব্যক্তি এখানে তাদের দলিত করত—তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত।

উপরের আকাশ তেমনি সুনীল, পূর্বাকাশের আলো তেমনিই নিপুণ শিল্পীর তুলিকার রঙ ধরানো; চারিদিকের গাছপালা লতা—তাদের পুষ্পভারে তেমনিই নত, গন্ধ-উপহারে ব্যগ্র।

শুধু যে থাকলে এ সব সার্থক হত, পূর্ণ হত সে-ই নেই।

তার কি হল—সেইটেই এখন বড় কথা।

পালাতে পেরেছে কি কোথাও, না এক প্রৌঢ়া রমণীর লালসার বহ্নিতে ঈর্ষার ইন্ধনে জ্বলছে—দুজখ্-এর জ্বালা হয়ত সেটা।

আর থাকতে পারলেন না শাহ্‌জাদী।

বহু ব্যয়ে সুসজ্জিত এই বেহেস্তি উদ্যান তাঁর কাছে একান্ত অরুচিকর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এর বাতাসে বিষ।

লালকিলার পাষাণপ্রাচীরে কাল দেখেছিলেন রক্তাভা।

আজ মনে হল তা বুঝি রক্তাক্ত।

কদম কদম ক'রে আবার প্রাসাদে নিজের মহলে ফিরে এলেন।

না, কাঁদলেন না, কান্না আর নেই। অর্ধমূর্ছিতের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়লেন।

রাজধানীর প্রাসাদ-দুর্গের ঘুম ভাঙল ক্রমশ। শুরু হল তার কর্মব্যস্ততা।

জিনৎউন্নিসার সেবিকারা বার বার পর্দা সরিয়ে দেখে গেল। নাস্তার কথা বলতেই সাহস হল না কারও।···

আর, যিনি প্রভাতের গুসলই করেন নি এখনও, তাঁকে নাস্তার কথা প্রশ্ন করাই তো মূর্খতা।

শাহ্‌জাদী কি প্রহর গুণছেন ?

একটির পর একটি সাৎ [ঘণ্টা] কাটছে। উনি ত্রি:পোলিয়ার ঘড়ির দিকে কান পেতে আছেন।

শেষে নটা বাজতে যেন চমকে উঠে পড়লেন।

পোশাকটা বদলাতে হবে, প্রসাধনে ত্রুটি থাকা চলবে না।

বাদশার ব্যবস্থা অনুসারে রৌশনআরা বেগম সাহেবা—হারেমের ঠিক কর্ত্রী না হলেও অভিভাবিকা। বিশেষ ভ্রাতুষ্পুত্রীদের আদব-কায়দা শাহীমর্যাদা ইত্যাদি শেখাবার ভার তাঁর উপর।

রীতি নিয়মের ব্যতিক্রম হলে, আদবে গলৎ থাকলে তিরস্কার করবেন তিনি, সে অধিকার তাঁর আছে।

শুধু তাই নয়, অন্দরের মধ্যেই এক মহল থেকে আর এক মহলে যেতে হলে সম্রাজ্ঞী বা সম্রাটপুত্রীদের শিবিকায় যাওয়া নিয়ম। সে জন্য ছোট এক রকম ডুলি প্রতি মহলেই থাকে, ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া। তাতারিণীরা তা বহন ক'রে নিয়ে যায়।

এবং বিনা এত্তেলায় যাওয়াও রেওয়াজ বিরুদ্ধ।

শুধু এত্তেলা নয়, গুরুজন সমীপে যেতে গেলে হুকুম নেওয়াও দরকার।

এ সবই জানেন, কিন্তু শাহ্‌জাদীর অত ধৈর্য নেই। এত্তেলা একটা পাঠালেন, তবে প্রায় তার পিছু পিছুই গিয়ে হাজির হলেন

ফুফীজানের মহলে। বাহিকা ডেকে বাহনের ব্যবস্থা করা কিছু সময়-সাধ্য, তাছাড়া শিবিকা দেখলেই কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠবে, কে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে। তার চেয়ে একটা বুরখা চাপিয়ে নিজে চলে যাওয়া ঢের সোজা।

আজ শাহ্জাদী কতকটা বেপরোয়াই হয়ে উঠেছেন।

জীবনের চিরাগ নিভে যেতে চলেছে চিরদিনের মতো—এখন আদবকায়দা বাঁচিয়ে চলা সম্ভব নয়।

কি করবেন বাদশা, কেটে ফেলবেন ? ফেলুন না। ভালই তো।

জিনৎ যখন মহামান্য রৌশনআরা বেগম সাহেবার মহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তার কিছু পূর্বেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। পুরোপুরি গোসল হয় নি, কোন মতে মুখে চোখে জল দিয়ে রাত্রিজাগরণ ও অমিতাচারের কালিমা ঢাকা দেবার মতো একটু প্রসাধন সেরে নিয়েছেন। ফজরের নমাজ হয় নি, সম্ভব হয় না কোনদিনই—তবে একেবারে বাদ দিতেও সাহসে কুলোয় না। ভাইজান জানতে পারলে কঠিন তিরস্কার করবেন। তাই এই সময়, অনুকল্প হিসেবে একটু সেরে নেন। কিন্তু আজ তার আগেই মুন্নী বেগম এসে পড়লেন। বিরক্ত হলেন কি খুশি হলেন তা বোঝা গেল না।

মুন্নী বেগমের বিশ্বাস—উনি বেঁচেই গেলেন।

কোন পক্ষেই কুশলপ্রশ্ন, সৌজন্য-সম্ভাষণ ইত্যাদির ত্রুটি হল না।

যা রীতি তা সবই ঠিক ঠিক পালন করা হল।

তার পরই, বাঁদীকে দুজনের মতো শরবত আনার আদেশ ক'রে দিওয়ানের উপরই মোটা তাকিয়ায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তার পর বেটি, কি মনে ক'রে এত সকালে, এতদিন পরে ফুফীকে দেখতে এলে !'

তার পরই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর, 'তুমি কি হেঁটে এলে ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি। শাহী হারেমের আদব ভুলে গেলে !'

'এইটুকু পথ—ক পা-ই বা, এর জন্যে ডুলি চড়তে আমার হাসি পায়।'

'না না, এ হাসির কথা নয়। আলা হজরৎ জানলে খুব রাগ করবেন।'

'জানাবার জন্যে আমি অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই জানাব।'

'তুমি কি মনে করো, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করবেন না?' অকস্মাৎ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন রোশনআরা।

'তা কেন মনে করব ফুফীজান। তিনি বাদশা তায় পিতা, দুনিয়ার মালিক, আমারও মালিক। তাঁর তিরস্কার মাথা পেতে নেব। আমি তাঁকে জানি, নিজে গিয়ে নিজের কসুর কবুল করলে তত রাগ করবেন না—অপরের মুখ থেকে শুনলে যতটা করবেন। তা ছাড়া, আমি তাঁকে বোঝাব এ ব্যবস্থাটা কত হাস্যকর।'

'পারবে বোঝাতে?'

'চেষ্টা করব অন্তত।'

'কিন্তু আমারও কিছু দায়িত্ব আছে, শাহানশাহ্ তোমাদের শিক্ষার ভার আমার ওপরই দিয়েছেন।'

'সে কথা পরে বলব ফুফীজান, এইসব বাজে কথাতেই তো সময় চলে যাচ্ছে। আমার কিছু আরজ আছে যে।'

অপ্রসন্ন মুখে রোশনআরা বললেন, 'তোমারও এ কথাটা চাপা দেওয়া উচিত হচ্ছে না। শাহী হারেমে আদবের প্রশ্ন বড় প্রশ্ন একটা। যাক, তোমার কি আরজ বলো।'

ততক্ষণে শরবত এসে গেছে। 'আদব'-এর মর্যাদা রাখতে রোশনআরা দাসীর হাত থেকে নিজে নিয়ে জিনতের হাতে দিলেন, জিনৎও কায়দামাফিক সে পাত্র কপালে ঠেকিয়ে এক চুমুক পান করলেন। এমনিই তাঁর পান ভোজন কিছুই ভাল লাগছে না, তার উপর ঐ এক চুমুকেই মনে হল ফলের রসের সঙ্গে কিছু শিরাজীও মেশানো হয়েছে।

তবে সে কথা এখন বলা চলবে না। এমনিই খুব ভুল হয়ে গেছে, সমানে তর্ক করা উচিত হয় নি। দোষ স্বীকার ক'রে নিয়ে মাথা নিচু করাই উচিত ছিল।

খয়ের, সে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন দোয়া মাগবার ভঙ্গীতে দুহাত জোড় ক'রে বললেন জিনৎ, 'ফুফীজান, আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা চরম স্পর্ধার কথা—হমাকৎ তো বটেই, গুস্তাকিও। আমার তাই বলতে সাহস হচ্ছে না। আপনি যদি আগে থাকতেই মাপ করার আশ্বাস দেন তবেই বলতে পারি।'

এবার সোজা হয়ে বসলেন রৌশনআরা।

'সে আবার কি। এমন কি কথা যে তা গুস্তাকি আর হমাকৎ দুই-ই।'

মাথা হেঁট ক'রে থাকেন জিনৎ। তাঁর সুগৌর মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে—লজ্জাতেই সম্ভবত—চুলের কোলে কোলে মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম জমে উঠেছে দেখতে দেখতেই।

রৌশনআরাও আর অপেক্ষা করতে পারেন না, কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন—জিনতের বিনত ও বিব্রত ভঙ্গী দেখেই সম্ভবত মনটা কোমল হয়েছে—'তুমি আমার কন্যার মতো, সেই ভাবেই তোমাদের দেখে এসেছি, এখনও দেখি—তোমার কোন গুস্তাকি আমার কাছে হতে পারে না, আর হমাকৎ? তেমন হলে সংশোধন করার চেষ্টা করব, বুদ্ধি দেবার—তাতে গরম বা খিশ্‌মনাক হবো কেন?'

আশ্বাস যে খুব একটা পেলেন জিনৎ তা নয়, 'গরম' যে ফুফী হবেন তা তিনি জানেন, এটা শুধু দোষ কাটিয়ে নেওয়া হল।

তিনি ভয়ে ভয়ে থতিয়ে থতিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'এ শরমন্দাগী, লজ্জার কথাও বটে। তবে আপনি আমার দুঃখ বুঝবেন এই ভরসাতেই বলছি।'

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন, লজ্জায় দুহাত কচলাচ্ছিলেন,

[গুস্তাকি—বেআদবী, দুর্বিনয় : হমাকৎ—নির্বুদ্ধিতা।]

সেই ভাবেই তার পর আরও অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'আমি শাদী করি নি, আপনাদের আদর্শেই—শাহানশাহ্ আকবর শাহ্ যে ধারা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই ধারাতেই চলা সঙ্গত মনে করেছি, কিন্তু, মনের দেহের ধর্ম তো একটা আছে, মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। তা অবশ্য আপনিও জানেন, শুনেছি আপনার মহলে কয়েকটি ছোকরা নৌকর আপনি রেখে দিয়েছেন, ভাল ঘরের ছেলে তারা, আপনার সেবা করবার জন্তেই আছে। যেদিন শুনেছি সেইদিন থেকেই আপনার দূরদৃষ্টি আর প্রজ্ঞার তারিফ করছি ?'

এই বলে, আর একটু থেমে যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন, 'তা তার মধ্যে থেকে একজনকে দিতে পারেন না আমায়।'

এ কথায় উনি অপ্রসন্ন হবেন তা জানতেন জিনৎ, কিন্তু এমন ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবেন তা ভাবেন নি।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সমস্ত মুখ অঙ্গারবর্ণ ধারণ করেছিল, এখন, জিনতের বক্তব্য শেষ হতে ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠের ভঙ্গী এমন হিংস্র হয়ে উঠল যে শাহ্জাদী ভয় পেয়ে দুপা পিছিয়ে গেলেন।

'কে, কে বলেছে তোমাকে একথা ? এতবড় হিম্মত কার ? যে বলেছে তাকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। শিগগির তার নাম বলো।'

সেই হিসহিস কণ্ঠস্বর আর চোখের আগুন দেখে জিনৎ একটা মিথ্যাই বলে ফেললেন। বললেন, 'আমি—মাফ করবেন ফুফীজান—আমি এটা আব্বাজানের কাছ থেকেই শুনেছি। তাছাড়া এর আগে একটা গোলমাল হয়েছিল—একটি জোয়ান ছেলের প্রাণ গিয়েছিল, তা নিয়ে লোক-জানাজানি হয়, আর সেই জন্যেই হারেমের সর্দার খোজাকে বদলি করা হয়েছিল—একথা তো সবাই জানে। একজন কার নাম বলব বলুন।'

গুম খেয়ে বসে থাকেন রোশনআরা কিছুক্ষণ।

তিনি ভগ্নী, এ বাদশার কন্যা। একে সহজে ভয় দেখানো যাবে না, অন্য কোন ভাবেও জব্দ করা যাবে না।

কিন্তু দেখতে দেখতেই রৌশনআরার চোখে সর্পিণীর দৃষ্টি জ্বলে উঠল। আধা অন্ধকার ঘরে জিনৎ অত টের পেলেন না।

হঠাৎই—তরুণী শাহ্‌জাদীকে কোন রকম প্রস্তুতির অবসর না দিয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাও বলো?'

অতর্কিত প্রশ্ন, উত্তরটাও অতর্কিতেই বেরিয়ে গেল।

যে নাম গত দুদিন দুরাত্রি ধরে অহরহ জপ করেছেন বলতে গেলে, যে নাম অস্থিতে মজ্জাতে রক্তে মিশে গেছে ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে, সেই নামই বেরিয়ে এল—'আনোয়ার'।

সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

উনি নির্বোধ নন, বিশেষ সম্রাটের অন্তঃপুরে মানুষ, ওঁদের যে প্রতিটি কথা হিসেব ক'রে বলা উচিত, সে শিক্ষা ওঁদের আবাল্য।

কারও নাম করলেই যে পূর্ব-পরিচয় স্বীকার করা হয়, সেই সঙ্গে যার নাম বেগম সাহেবার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা, এবং ওর সঙ্গে গোপন পরিচয় গোপন প্রেম—হয়ত বা ষড়যন্ত্রও—প্রমাণিত হয়, একথা প্রথম প্রেমের নবীন আবেগে জিনৎউন্নিসার একবারও মনে এল না।

মনে হল, ভুলটা বুঝতে পারলেন, নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

সাংঘাতিক, সর্বনাশা ভুল। সর্বনাশ দুজন কারই।

যদি বা কোন আশা থাকত, আর তেমন কোন আশা পোষণের অবলম্বন রইল না।

জিভ কাটলেন বারবার, কামড়ে ওষ্ঠ দুটি রক্তাক্ত ক'রে তুললেন, পাথরে মাথা খুঁড়ে মরতে যাবার ইচ্ছা করতে লাগল—কিন্তু, মুখের কথা, ঐ একটি মাত্র অতি প্রিয় শব্দ আর ফিরিয়ে নেওয়া গেল না।

এবার রৌশনআরা উঠে দাঁড়ালেন একেবারে। কেমন এক রকমের তিক্ত শুকনো হাসি হাসলেন বেশ শব্দ ক'রেই, তারপর

বললেন, 'সে আমাকে গোপন ক'রে অন্য কার সঙ্গে আশনাই করছিল নাকি কদিন ধরে। হারেমের পাহারাদাররা তাকে গিরিফতার করেছে। সে এখন কয়েদখানায়। কোথায় তাকে রাখা হয়েছে জানি না।·· আর অন্য কাউকে? যদি আর কারো নাম জানা থাকে তো বলো, ভেবে দেখবো।'

সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

আর কারও নামে তাঁর প্রয়োজনও নেই, জানেনও না।

জানলেও আরও একজনের মৃত্যুর বা তারও অধিক যন্ত্রণার কারণ হবেন কেন?

'আনোয়ার—আনোয়ারের খবর জানা সম্ভব হবে না?'

আবারও সেই তিক্ত হাসি। বিষাক্ত।

কথা যে এমন সাপের ছোবলের মতো কামড় দেয় এই প্রথম জানলেন।

'তুমি বাদশা সালামতের পিয়ারের মুন্নী বেগম, তোমার পক্ষে আর অসম্ভব কি আছে। ছাখো খোঁজ ক'রে।'

এবার কঠিন হয়ে উঠল জিনৎউন্নিসার মনও।

কার্যকারণ সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। আনোয়ার যা আশঙ্কা করেছিল তাই হয়েছে। হয়ত অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করছে নয়ত বা ওফাত—মৃত্যুই ঘটেছে। জিনতের জন্যেই এটা হল। তবে আর ফুফীকে ভয় করবেন কেন?

এখনও উনি চাইছেন মুহব্বৎটা যে তাঁর সঙ্গেই হয়েছিল, সেইটে স্বীকার করিয়ে নিতে।

শাহ্জাদীর তাতে লাভ কি?

জিনৎও মরীয়া হয়ে উঠবেন বৈকি।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে এই শয়তানী। তাই নিয়ে বিদ্রূপ করছে, তামাশা দেখছে।

তিনিও বাদশা আলমগীরের কন্যা—সে পরিচয় দিয়ে দেবেন ওকে ভালমতেই।

এক প্রকারের শাণিত কণ্ঠে, 'তাই দেখব' বলে বেরিয়ে এলেন, গুরুজনকে কোনরকম আদাব কুরনিশ না জানিয়েই।

আর কি করবেন ফুফী!

বড়জোর আদবের খেলাপ করার জন্য নালিশ করবেন শাহান্‌শাহ্‌র কাছে।

করে দেখুন না!

॥ আট ॥

জিনৎউন্নিসা শিবিকা নিয়ে না এলেও সুসজ্জিত হয়েই এসেছিলেন।

সজ্জা অর্থে শুধুই রূপসজ্জা নয়, আরও কিছু ছিল।

হাতিয়ার ছিল একটা, খাপে ঢাকা কোমরে গোঁজা ছোট একটি বাঁকা ছুরি—কিরীচের* মতো। আর ছিল দু-তিনটি রুমালে বাঁধা অর্থ, প্রতিটি রুমালে পঁচিশটি করে আশরফি বা মোহর।

আব্বাজান বলেন, দুনিয়ায় লোহার হাতিয়ারই সব নয়—টাকাই আসল হাতিয়ার। টাকা না থাকলে লড়াই চলে না। সে কথা জিনৎ ভোলেন না কখনও।

কথাটা ওঁর প্রয়োজনে লাগেনি এখনও অবধি, তবু শিক্ষাটা মজ্জাগত হয়ে গেছে বলেই, কোথাও যেতে হলে সঙ্গে টাকা রাখেন সর্বদা।

রৌশনআরার ঘর থেকে বেরিয়ে আরও একটি ঘর, তারপর একটু দালানের মতো। তারও দরজা-জানলা আছে। তারপর চলন, অন্য অন্য মহলে যাবার। এই দালানের দুই প্রান্তে ছোট ছোট কুটুরী—খাস বাঁদীদের থাকার। দুজন বৃদ্ধ খোজাও থাকে। বাইরের কাজের জন্যে।

জিনৎ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন খুবই কিন্তু ক্রোধে জ্ঞান হারান নি।

বরং চরম অবস্থার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা আশ্চর্য প্রশান্তি এসেছে তাঁর। আমীর-তৈমুর বাবর শার লোহু বিপদের মুখে শান্ত থাকার শিক্ষা দেয়, তাঁকেও দিয়েছে।

তিনি এঘর থেকে বেরিয়ে—রৌশনআরা ও-পাশে তাঁর শয়ন কক্ষে চলে গেলেন তা বেরিয়ে আসতে আসতেই লক্ষ্য করেছেন—

*পোর্তুগীজ ভাষায় Kris, বাঁকা তলোয়ার। এগুলি লম্বায় ছোট হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এর চলন বেশি।

পরের ঘরে পৌঁছে গতি শ্লথ ক'রে দিলেন। পা পা ক'রে হাঁটতে লাগলেন।

আর যে উদ্দেশ্যে এই মন্থরতা, তাও সিদ্ধ হতে দেরি হল না।

রৌশনআরার এক খাশ বাঁদী কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এল।

খুঁজছিলেন একেই।

একে না পেলে অন্য দাসীকে দিয়েও কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতেন হয়ত। টাকায় কি না হয়। তবে তাদের ওপর এতটা নির্ভর করতে পারতেন না।

এ দাসী তাঁর পরিচিত—তহ্‌মিনা এক কালে সাহিবাৎ-উজ-জমানীর দাসী ছিল, এখন নিতান্ত অরুচির সঙ্গেই এই মালেকার সেবা করছে। যে জাহানআরার কাছে কাজ করেছে তার পক্ষে রৌশন-আরার নৌকরি করা অপ্রীতিকর তো হবেই।

এদিক ওদিক দেখে দ্রুত তার কাছে গিয়ে আশরফি-বাঁধা রুমাল হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন জিনৎ, 'আরও দেব, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। শিগগির তোর ঘরে নিয়ে চল।'

বুরখায় মুখ ঢাকা, গলায় চেনা গেল।

'মুন্নী বেগম সাহেবা!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল তাড়াতাড়ি।'

কতকটা অভিভূতের মতোই তহ্‌মিনা নিয়ে গেল ওঁকে তার সেই ছোট কুটুরীতে, সেখানে বসার জায়গা বলতে তার একটি খাটিয়া। কোথায় বসতে দেবে ভেবে ঘেমে উঠেছে সে বলতে গেলে, জিনৎ নিজেই সে সমস্যার সমাধান করে দিলেন, সেই খাটিয়াতেই বসে পড়ে।

সময় আর মোটে নেই, তা জিনৎ জানেন। তিনি একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন, 'তোকে পঁচিশ মোহর দিয়েছি, আরও পঁচিশ দেব। আমাকে বল আনোয়ার কোথায় আছে, তাকে কি বেঁধে রেখেছে?'

মুখ শুকিয়ে উঠল তহ্‌মিনার। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কিন্তু, আপনি তো মালেকাকে ভাল ক'রেই জানেন বেগম সাহেবা,

আমি এসব কথা বলেছি জানলে আমাকে জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন। দোহাই আপনার, আমাকে মাফ করুন।'

মাফ করার সময় নেই।

সে ধৈর্যও নেই আর।

জিনৎ সম্রাট-পুত্রীর স্বরূপে ফিরে গেছেন চকিতে—চোখের নিমেষে বুকের মধ্যে থেকে ছোরাটা বার ক'রে একেবারে ওর গলায় ধরলেন, 'জিন্দা থাকলে তো কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবেন। বল, নইলে এই ছোরা এখনই তোর গলায় বসবে। আর, এখন আর তোর ভয় কি, বলতে পারবি মুন্নী বেগম বুকে ছোরা ধরে কথা আদায় ক'রে নিয়েছে।'

তহ্‌মিনা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে তখন, কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'সেই দিন আপনার ঘরের সামনেই ছেলেটাকে ধরেছে তারা হজরত কুম, আগে কাপড় জড়ানো একটা মুগুর দিয়ে মাথায় মেরে অজ্ঞান ক'রে ওকে বেঁধে ফেলে, তারপর গায়ে যে বুরখা ছিল তাতে জড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। এরা এই সব কাজই করে—হাতও খুব সাফ, তিন-চারবার চোখের পলক ফেলতে যা দেরি তাতেই নাকি কাজ হয়ে গেছে। আমার মালেকা এদের ডাকিয়ে তৈরী রেখেছিলেন, আসল হাবসী খোজা ওরা, দৈত্যের মতো এদের গায়ের ক্ষমতা।'

'কিন্তু ফুফী জানলেন কি ক'রে যে আনোয়ার ওখানে থাকবে?'

'আপনার বাঁদী বেইমানী করেছে হুজুরাইন, এসে খবর দিয়ে গেছে। মোটা বকশিশ পেয়েছে বটে কিন্তু তার জন্যেই যে করেছে তা নয়, এ আক্রোশ ওদের কেন তা কে জানে।'

সন্দেহ ছিলই। এবার নিশ্চিত হলেন।

ক্রোধে দুঃসহ দুর্দমনীয় ক্রোধে জ্ঞান হারাবার কথা, শুধু সম্রাট-বংশের আত্মসংযম-শিক্ষা তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ হতে দিল না।

'ওদের সাজা দিতে আমার দেরি হবে না তহ্‌মিনা, কিন্তু তার আগে বল আনোয়ারকে কি ক'রে বাঁচাবো।'

এবার ভয়ে নয়, মমতাতেই তহ্‌মিনার চোখের জল এসে গেল। সে প্রায় রুদ্ধ গলায় বললে, 'আর কাকে বাঁচাবেন মুন্নী বেগম। তার দেহটা থেঁৎলে পিষে দিয়েছে বোধ হয়। বাঁচবে না কিছুতেই—শুধু জোয়ান ছোকরার 'টান' বলেই এখনও প্রাণটা ধুকধুক করছে। আমি তো একমনে খোদাতালার কাছে মোনাজাত জানাচ্ছি, যদি আমার কোন সওয়াব থাকে, যদি একদিনও পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে থাকি তাহলে ওর প্রাণটা নিয়ে নিন তিনি। সে কষ্ট দেখা যাবে না শাহ্‌জাদী সাহেবা।'

ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ালেন জিনৎ।

'থাক তহ্‌মিনা থাক।···এখন কাজের কথা বল, সময় আর মোটে নেই।'

'আর কি কাজের কথা বেগম সাহেবা?'

'আমাকে সেই ঘরে নিয়ে যেতে হবে একবার। যেমন ক'রেই হোক।'

মাথা নাড়ল তহ্‌মিনা, তখনও তার চোখে জল। সেই সঙ্গে একটু দুঃখের হাসিও।

'সে সম্ভব নয় মুন্নীবেগম, অন্তত আমি পারব না।'

'পারতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক। আমার যে তাকে ওয়াদা দেওয়া আছে, যেতেই হবে আমাকে। কত টাকা লাগবে বল।'

'টাকার সওয়াল নয় হজরৎ বেগম সাহেবা। মাটির নিচে দুটো তলা আছে পুরো তা বোধ হয় আপনি জানেন—প্রথমটায় থাকেন কিছু কিছু বেগম সাহেবা, বিবি সাহেবারাও, যাঁরা কখনও কখনও শাহ্‌জাদাদের কি শাহানশার সেবায় লাগেন, তার নিচের তলায় বাঁদী নৌকরীন্, তাতারী মেয়ে-ছেলেগুলো—তার বাবুর্চিখানা, তার জন্যে যা লাগে ভাঁড়ার—মানে মাথজান—বহুত মাল রাখতে হয়, হাইজামই [কাঠ] কত আগুন করার জন্যে।

'এ দুতলার খবর সকলেই রাখে। কিন্তু তার নিচে আর এক তলা আছে। সেখানে বাতাস যাবার জন্যে নল আছে, আলোর জন্যে

চিরাগ ভরসা, তার কতকগুলো ঘরে কিছু কিছু দরকারী জিনিস আছে, যার চাবি একমাত্র শাহানশাহ্‌ই রাখেন। কিছু ঘরের চাবি থাকে উজীর-এ-আজম-এর কাছে। বাকি কয়েকটা ঘরে কয়েদখানা করা আছে, বিশেষ বিশেষ কয়েদীদের জন্যে—যাদের কারও সামনে সাজা দেওয়া যাবে না। তাকে কয়েদখানাও বলতে পারেন মৌৎখানাও বলতে পারেন। কারণ সেখানে যারা যায় অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তাদের মারা হয়। সে ঘরে লোহার কপাট—তার ভেতর যতই চেঁচামেচি করুক কেউ শুনতে পাবে না। সেখানে, তেমন দরকার হলে চিতাবাঘ ছেড়ে রাখা হয়, কিংবা মানুষ-খেকো কুত্তা। তার পাহারায় থাকে হাবসী খোজা—বোবা আর কালা, তারা শুধু তাদের নিজের মালেকাকে চেনে, তাঁর হুকুম ছাড়া কিছু করে না।'

বুকের রক্ত হিম হয়ে আসারই কথা, হাত পা অবশ অবসন্ন।

কিন্তু এমন পাথরের মতো হয়ে গেল কেন?

আর যেন কোন কিছুই বোধ হচ্ছে না। কোন যন্ত্রণা কোন আঘাতই নয়।

জিনৎ প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মালেকা কখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেন রাত্রে?'

তহ্‌মিনা অবাক হয়ে খানিকটা চেয়ে রইল, কথাটার ঠিক অর্থ বুঝল না। তবে শাহ্‌জাদীর কপালের ভ্রূকুটিতে অসহিষ্ণুতাটা বুঝল। তাড়াতাড়ি বলল, 'দেউড়িতে ন ঘণ্টা বাজার পরই প্রায় নিজের শোবার ঘরে যান। সেখানেই দুতিন জন আরও থাকে। কিছু খানাও সেখানে পাঠাতে হয়। ঘুমোন কটায় তা বলতে পারব না—তবে সেই যে দরওয়াজা বন্ধ হয়, আর কাউকেই ডাকেন না বা ঘরে ঢুকতে দেন না। কেবল একটা ঘণ্টা আছে, সেটা বাজালে ফরিদা বলে ওঁর এক পুরনো বাঁদী আছে সে যায়। সে তার ঘরেই থাকে, ঘুমোয়—ঘণ্টা তার ঘরের মধ্যে বাজে, ঘণ্টা শুনলে সে ছুটে যায়। তবে তেমন ডাক পড়ে কদাচ কখনও।'

মন স্থির করাই ছিল।

এখন তো তা যন্ত্রের মতো হয়ে গেছে।

আরও কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন জিনৎ, 'আমি রাত দশটায় এখানে হাজির হবো। এই টাকায় তুমি কিছু জহর কিনে মাংসতে মিশিয়ে ঐ কুকুরগুলোকে খাইয়ে দিও কিছু আগে। আর তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করব। শুধু তুমি ঘরটা দূর থেকে দেখিয়ে দিও।'

'আমাকে—আমাকে মাপ করতে পারেন না শাহ্‌জাদী?' প্রায় কান্নার সুরে বলে তহ্‌মিনা।

'না, সে উপায় নেই। তুমি এইটুকু করো, তোমার কোন বিপদ হলে আমি দেখব। নইলে আমিই শাহানশার কাছে নালিশ করব তুমি একটা বুরা কাজ করেছ। কয়েদ করিয়ে দেব। সিধা কথা আমার।'

আর দাঁড়ালেন না শাহ্‌জাদী, বুরখায় মুখ ঢেকে সোজা চলে গেলেন।

নির্জনে কাঁদতে?

না, কান্না আর তাঁর নেই।

প্রতিহিংসার আগুনে বুঝি সব অশ্রুই শুকিয়ে গেছে তাঁর দেহের।

কঠিন করেছেন নিজেকে, প্রাণপণে, শাহী রক্তের শিক্ষায়। কর্তব্য আগে, ওয়াদা দেওয়া আছে, সেটা পূরণ করতেই হবে।

জীবন জিন্দিগী তো শেষ হয়েই গেছে, আর কেন দুঃখ করবেন, কার জন্য বিলাপ হাহাকার করবেন?

ঠিক সময়েই জিনৎউন্নিসা প্রস্তুত হয়ে বেরোলেন নিজের মহল থেকে।

তেমনি পায়ে হেঁটেই রওনা দিলেন রোশনআরা বেগম সাহেবার মহলের দিকে। সকালের সেই বুরখা পরা। বেশভূষাতেও কোন পরিবর্তন নেই। কুর্তা জুতা কিছুই বদলালেন না। সেই ভেলভেটের চটি পায়ে, যা সর্বদা পরে বেড়ান ঘরে।

দাসী বা সেবিকা, খোজা নৌকরদের কৌতূহলের সীমা নেই সেই সকাল থেকেই। এ কী রকম কাণ্ড-কারখানা বাদশাজাদীর। ডুলি নেই, সঙ্গে দাসী নেই—তাতারী দেহরক্ষিণী কাউকে সঙ্গে নিলেন না—একা পায়ে হেঁটে হটর হটর করে যাচ্ছেন—এমন ঘটনা তাদের এতখানি বয়সে দেখে নি। মুঘল হারেমের, বিশেষ শাহ্জাদীদের মর্যাদা বলতে আর কিছুই তো রইল না।

ব্যাপারটা কি ঘটছে তাও তো বুঝতে পারছে না ওরা। পিসীর পিয়ারের পোষা ছোকরার সঙ্গে আশনাই করলেন—পিসী খবর পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে কয়েদ করলেন কিংবা মেরেই ফেললেন। ভাইঝি সকালে ঐভাবে পাগলের মতো ছুটলেন—সম্ভবত ঝগড়া করতেই। তখনই একটা ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামেচি আশা করেছিল ওরা—পিছু পিছু গিয়েও ছিল কেউ কেউ রোশনআরা বেগম সাহেবার মহলের দরওয়াজা পর্যন্ত। অবশ্যই সেখানের পাহারাদাররা ঢুকতে দেয় নি—দেবে না সে তো জানা কথাই। কিন্তু কৈ, কোন চেঁচামেচি কি জুতো ছোঁড়া-ছুঁড়ির তো কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না।

বেরিয়ে এলেনও তাদের মালেকা অনেকক্ষণ পরে। যেন বেশ গল্পগুজব হাসি তামাশা করে। আবার তো মনে হয় সেখানেই যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কি! কি ঘটছে ওখানে? সেই ছোকরার সঙ্গে ফুর্কীজান মুন্নী বেগমের শাদী দিচ্ছেন নাকি? তবে তাই বা কি ক'রে হবে। বাদশা তা বরদাস্ত করবেন কেন? বিশেষ এই বাঘের মতো বাদশা। একবার চাইলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। তা ছাড়া শাহ্জাদীর শাদী—ঘটা তো কিছু হবেই। শাদীয়ানা, আনন্দউৎসব না হলে শাদী কি?

আরও একটা জিনিস ভাল লাগছে না তাদের।

ঠিক যাওয়ার আগে—তখনও বুরখাটা মুখে ঢাকা দেন নি মালেকা, রুকেয়া ও আর একজন বাঁদী সামনে গিয়ে পড়েছিল—তাদের দিকে যে একটা চাউনি হানলেন—এমন কখনও দেখে নি তারা। শান্ত দৃষ্টি, ভ্রূকুটির চিহ্ন মাত্র নেই কিন্তু সেই চাহনিতেই যে

ঘৃণা ক্রোধ আর বিদ্বেষ ফুটল—সে রকম যে কারও দৃষ্টিতে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব তাই জানে না। কোথাও, কারো চোখেই দেখেনি কখনও।

অস্বস্তি, দারুণ অস্বস্তি।

পালাবে নাকি তারা ?—একবার ভাবে। ভয়ে পাগল হয়ে গেলে অসম্ভব আর অবাস্তব পথই মনে পড়ে বাঁচবার।

কোথায় পালাবে ? এ জাহানে এমন কোন স্থান আছে ? এমন কোন পথ যেখানে শাহী-নিজামতের হাত বা চোখ পৌঁছবে না !

তারা কেনা বাঁদী কেনা গোলাম, তাদের কোথাও যাবার কানুন নেই, মালিক বা মালেকার হুকুম ছাড়া। তাদের কেউ আশ্রয়ও দেবে না, সাহায্যও করবে না। করলে তাকেও সাজা পেতে হবে সরকারের।

উশখুশ করে রুকেয়াই বেশি।

তাকে অন্য বাঁদীরা—ভয় তাদেরও কম নয়—কারণ তারাও এ 'মজা' বা তামাশার মধ্যে ছিল—বোঝায়, 'এখনও সময় আছে, তুই গিয়ে মালেকার পায়ে পড়, অপরাধ স্বীকার কর। ওঁর একটা পায়ের চটি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক—রাগ পড়বে। মানুষটা তো খারাপ নয়, মায়াদয়া আছে।'

রুকেয়া বেঁকে দাঁড়ায়, বলে, 'আমি একা পায়ে পড়ব কেন, তোরাও চল। তোরা তো সবাই ছিলি এর মধ্যে। বড় বেগম-সাহেবার বকশিশ তো তোরা সবাই বেটে নিয়েছিস—আমি কেন শুধু শের-এর সামনে পড়ব।'

আলোচনা আর কিছুক্ষণ চললে হয়ত তাই যেত সকলে—তবে তার আর সময় পাওয়া গেল না।

বজ্র যে এমন নিঃশব্দে, এত কাছে উদ্যত হয়ে ছিল তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি।

আর, শাস্তিটা যে এমন চরম এমন সাংঘাতিক হবে তাও না।

এত দ্রুত, এত অকস্মাৎ এমন অব্যর্থ ভাবে— !

হঠাৎ একদল হাবসী খোজা পাহারাদার এসে ঘিরল ওদের—চোখের নিমেষে বেঁধে ফেলা হল। জোড়ায় জোড়ায়, হাতে পায়ে বাঁধন দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হল। দু-একজন কি বলবার চেষ্টা করেছিল, কোড়ার ঘা এসে পড়ে একেবারেই যখন অনেকখানি চামড়া মাংস নিয়ে উঠল—তখন আর কারও টুঁ শব্দ করতে সাহস হল না। তখন যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভয় হচ্ছে।

কে একজন খোজাই জিজ্ঞেস করল, 'এদের মালপত্র?'

'কি আর হবে? এদের কি আর কাজে লাগবে কোন জিনিস? এই যে কয়েদখানায় ঢুকবে, আর কি জিন্দা বেরোবে কোনদিন? মনে তো হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গেই হারেমের যে প্রধানা দাসী সে একদল নূতন বাঁদী এনে হাজির হয়েছে—পুরাতন বাঁদী ও পাহারাদারনীদের নিয়ে চলে যাবার আগেই। ওরা যেতে যেতেই শুনতে পেল—তাদের কার কি কাজ কে কি ভাবে থাকবে দিনে ও রাতে, মালেকার সামান্যতম ডাকেও সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতে হবে, ইত্যাদি।

আর, যেতে যেতেই একজনের মনে পড়ল বিকেলে মীর-ই-বকাওলকে লেখা শাহ্জাদীর এক মোহর করা খৎ সে-ই বাইরে এসে এক প্রহরীর হাতে দিয়েছে। তখনই যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। অর্থাৎ নিজের ওফাত বা মৃত্যুর পরোয়ানা নিজেই বয়ে নিয়ে গেছে। এত আতঙ্কের মধ্যেও তার হাসি পেল একটু।

এই পুরাতন দলের মধ্যে একমাত্র পিশ খিদমৎ ছেলেটাই অব্যাহতি পেল—কারণ গত তিন দিন সে অসুস্থ ছিল। সেটা মনে ছিল জিনৎউন্নিসার।

---

* চাবুকের মতোই একটা বস্তু—একটা হাতলের মধ্যে অনেকগুলি চামড়ার দড়ি, তার প্রত্যেকটিতে অনেক গিট বাঁধা—এর আঘাতে চামড়া কেটে ওই চাবুকের সঙ্গে উঠে আসে, ইংরেজিতে একই বলে ক্যাট অফ নাইন টেলস্।

॥ নয় ॥

জিনৎ যখন রৌশনআরা বেগম সাহেবার মহলে পৌঁছলেন, তখন বাইরে কোন পাহারাদার বা ভিতরে তাতারিনীরাও কেউ ছিল না। সম্ভবত তহ্‌মিনাই তাদের সরিয়ে দিয়েছে কোন কৌশলে, সে পুরনো লোক, অনেক ফিকির জানে।

তহ্‌মিনা একাই মহলের প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছিল শঙ্কাবিবর্ণ মুখে। শাহ্‌জাদী নিঃশব্দেই ঢুকে এলেন, তহ্‌মিনাও নিঃশব্দে দরওয়াজা বন্ধ ক'রে বিনাবাক্যে নিচের সিঁড়ির দিকে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল।

তার খালি পা, তাও শঙ্কা কোন শব্দ হচ্ছে কিনা।

এ প্রাসাদের পাথরগুলোও যেন কান পেতে চোখ মেলে থাকে সর্বদা, মালিক-মালেকাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে।

সিঁড়ির দুদিকে, খিলেনের ওপরে মধ্যে মধ্যে তেলের আলো জ্বলছে—প্রত্যেকটি আলোর ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে সঙ্গে সঙ্গেই—তাই এখানে কোন অসুবিধা নেই। আলো সামান্যই কিন্তু অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ এদের, দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

তাইতেই নজরে পড়ল জিনতের—তহ্‌মিনা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

হাসলেন শাহ্‌জাদী। কঠিন শব্দহীন হাসি।

চরম আঘাতে তাঁর তৈমুর চেঙ্গিজের রক্ত জেগে উঠেছে। দয়া মায়া ভয় কিছুই আর নেই কোথাও। শুধু প্রতিশোধ—এই তখন একমাত্র চিন্তা।

দুতলা ভেঙে এসে তাঁরা নিচের দিকের ত্রিতলের পথ ধরলেন।

অস্ফুট স্বরে জিনৎ শুধু উচ্চারণ করলেন, 'কুত্তা?'

'বোধ হয় ঐ সিঁড়ির নীচে কোথাও মরে পড়ে আছে।'

কয়েদ ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে নেমে গেল তহ্‌মিনা।

শুধু আঙুল দিয়ে সে ঘরের দিকটা দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ওপরের পথ ধরল। আর অপেক্ষা করার সাহস নেই তার।

সে শর্তও তো নেই।

কেন সাহস নেই তা নিচের দিকে এক নজর দেখেই বুঝতে পারলেন শাহ্‌জাদী।

রূপকথার দানোর মতো মিশকালো এক হাবসী খোজা ধীরে ধীরে সেই বদ্ধঘরের সামনে পায়চারি করছে। বিরাট দেহ, মনে হয় কালো পাহাড় একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে—সুদূর কাফির মুলুকের পাহাড়ের মতোই। কালো তাতে বিপুল কালো ঘন লোম, পিঠেও তেমনি। মাথায় একটা কালো কাপড় বাঁধা শুধু, হাতে খোলা একখানা কিরীচ—বা বাঁকা তলোয়ার। সেটাও, দেখলেই বোঝা যায়, যেমন ধারালো তেমনি ভারি।

খোজা প্রহরী বোধহয় নিশ্চিন্ত ছিল কুকুররা আছে ভেবেই। কোন অপরিচিত মানুষ এ ঘরের কাছাকাছি এলেই ওরা অতর্কিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—নিমেষে টুকরো টুকরো করে দেয়। তাই তার পাহারা দেওয়া কতকটা নিয়ম রক্ষা।

শাহ্‌জাদী বুরখার ভিতর থেকে তাঁর তলোয়ার বার করলেন—ছোট তলোয়ার কিন্তু অত্যন্ত ধারালো—তারপর দৃঢ় মুষ্টিতে সেটা বাগিয়ে ধরে ত্বরিত নেমে এলেন পাহাড়টার কাছে।

এবার শব্দ কানে গিয়েছিল বৈকি। নির্জন নিস্তব্ধ স্থান, গভীর রাত—কোথাও কোন আওয়াজ নেই, পোশাক খসখস ক'রে উঠলেও তা কানে যায়।

শব্দ যে পাবে তা শাহ্‌জাদী জানতেন। এক্ষেত্রে বাঁচার বা কার্যসিদ্ধির উপায় সময়ের নিখুঁত হিসেব। কতটা তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারেন তার ওপরই ওঁর বাঁচা বা সম্মান রক্ষা নির্ভর করছে।

ওঁরা বাল্যে সহবৎ বা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষাও পেয়েছেন।

এ ব্যবস্থা ওঁদের বংশে বহু কাল ধরে চলে আসছে, কতকাল—তা কেউ জানে না।

তখন অস্ত্রচালনায় প্রধান ও প্রথম পাঠই হল ক্ষিপ্রতা।

কানে গিয়েছিল কিন্তু প্রস্তুত হবার সময় পেল না বেচারি। এদিকে ফিরতে যাবে—তার আগেই, যেন বিদ্যুৎ বেগে, শাহ্জাদীর তলোয়ার বিঁধল তার পিঠে।

একটা মাত্র অস্পষ্ট শব্দ ক'রেই পড়ে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তলোয়ার টেনে নিলেন জিনৎ। ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে তাঁর বুরখা ভিজিয়ে দিল। তা দিক, ওসব কথা ভাবতে কি বুঝতে গেলে চলবে না।

চাবি, চাবিটা কোথায় ?

চাবি নিশ্চয়ই ওর সঙ্গেই আছে।

কোমরে কি অন্য কোথাও গোঁজা।

পাহাড়ের মতো দেহ—কাত করানো কি পাশ ফেরানো যাবে না। ঘর্মাক্ত দেহ, প্রচণ্ড দুর্গন্ধও তাতে। তবু হাত দিতে হল। সৌভাগ্যক্রমে যে দিকটা ওপরে সেই দিকেরই কোমরবন্ধে বাঁধা ছিল চাবির গোছা।

সময় নেই, সময় নেই। তাড়াতাড়ি করো শাহ্জাদী, জুদ তুরন্ত কাজ সারো। মনকে বলেন বার বার।

কিন্তু বাদশাই হোন আর বাদশাজাদীই হোন দেহ ও মন মানুষেরই।

তার অবসাদ আছে, আবেগ আছে।

সব সময় তারা রক্ত বা শিক্ষার হুকুম মানবে তা সম্ভব নয়।

এতক্ষণ স্থির সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ থাকলেও, দুর্জয় সাহস আর কঠিন মন নিয়ে এগোলেও—সহসা যেন বড় দুর্বল বোধ করলেন এইবার, পা ভেঙে আসছে যেন, হাত কাঁপছে থরথর করে। দেখতে দেখতে ঘামে ভিজে গেল ভিতরের পোশাক—

কি দেখবেন কপাট খুলে, কী নৃশংস বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য, কী অবস্থায় আছে তাঁর প্রাণাধিক, তাঁর আজিজ—অনুমানেই এমন ভেঙে পড়লেন।

তবু প্রবল ইচ্ছাশক্তিরই জয় হল। একে একে তিনটে তালা খুলে ফেললেন। কপাটও খুললেন এক সময়—যতটা সম্ভব ধীরে।

কিন্তু যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল—অয় খোদা! যতই যা ভেবে থাকুন এর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুদূরতম কল্পনাও তাঁর এ নিষ্ঠুরতায় পৌঁছতে পারত না—যতই চেষ্টা করুন।

দুটো হাত আর দুটো পা শেকলে বেঁধে ওপরের পাথরে গাঁথা আংটা থেকে ঝুলিয়ে রেখেছে ওকে, হাত ও পায়ের সব কটি নখে বাবলার কাঁটা বেঁধা—অজস্র, যতটা জায়গা পাওয়া যায়, সমস্ত দেহ কোড়ায় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত, তার ওপর পোড়া দাগ—সম্ভবত লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে; এক বিন্দু জল দেওয়া হয় নি। ঠোঁট দুটো কালো হয়ে ফেটে গেছে পিপাসায়, শুকনো কাঠের মতো জিভ বেরিয়ে এসেছে খানিকটা; দুটি চোখ বিস্ফারিত কিন্তু চোখের মণি অর্ধেকটা উপরে চলে গেছে। আর, না আর দেখতে পারলেন না জিনৎ—অর্ধ মূর্ছিতের মতো পাথরেই বসে পড়তে বাধ্য হলেন।

হয়ত এমনভাবে অত্যাচারের নির্দেশ দেন নি ফুফীজান। এমন ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়—বহুদিন পরে হাতের কাছে একটা তরুণ ছেলে পেয়ে জল্লাদরাই তাদের অভ্যাস-গুলো ঝালিয়ে নিয়েছে।—তবু তিনিই তো দায়ী।

প্রাণপণে বল সঞ্চয় ক'রে উঠে দাঁড়ালো জিনৎউন্নিসা।

সময় নেই।

আর সময় নেই। আপসোস করার কি কান্নার সময় এটা নয়।

পাথরেরও কান আছে এখানে।

তহ্‌মিনাই বেইমানী করবে কিনা কে জানে!

মৃত বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।

প্রাণপণেই নিজের আবেগ দমন ক'রে সেইমত বা অর্ধমৃত দেহটার কাছেও গেলেন।

বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে আসছে, তাঁর অত প্রিয় দেহের এই অবস্থা দেখে, শবদেহে হাত দিতেও কেমন লাগছে, তবু স্পর্শ করতেও হল। দুচোখ বুজে বুকে কান পেতে শুনলেন।

আশ্চর্য। এখনও একটু ক্ষীণ ধুকধুক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যে।

রক্তের গতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।

আর একবার দেখে নিলেন ভাল ক'রে। না, বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। কোন হেকিম পারবেন না একে বাঁচাতে। শুধুই কষ্ট পাবে—আরও কষ্ট।

ঠোঁট দুটি নড়তে লাগল জিনতের—পরম করুণাময় খোদা-তায়ালার কাছেই তিনি প্রিয়তমের জীবন সঁপে দিলেন বুঝি, তাকেই নিবেদন করলেন।

তারপর অস্ফুট কণ্ঠে 'আমার অপরাধ নিও না আজিজ-ই-মন, সির্ফ তোমার ওয়াদা রাখছি। আমাকে মাফ করো।' বলে সেই তরবারীই আমূল বসিয়ে দিলেন আনোয়ারের বুকে।

॥ দশ ॥

সেদিন যে দৃশ্য দেখল, সেই প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে—লালকিলার কোন কোন অধিবাসীরা—তা তাদের চিরদিন মনে থাকবে।

একটি অন্ধকারের-সঙ্গে-মিশিয়ে-থাকা বুরখা পরা মূর্তি, সে বুরখার সর্বাঙ্গে রক্ত, হাতে একটা রক্ত ঝরা তলোয়ার—নিশ্চয়ই এখনই কাউকে হত্যা ক'রে আসছে; দ্রুতগতিতে, প্রায় ছুটে বাদশা-সালামতের কাজ করার ঘরের দিকে চলেছে। স্ত্রী কি পুরুষ তা বোঝা যায় না, কেবল প্রতি পদক্ষেপে একবার করে যখন পা বেরিয়ে আসছে, তখন বোঝা যাচ্ছে স্ত্রীলোকই এবং বাদশার ঘরেরই কেউ—সুন্দর সুগৌর পা, তার আঙুলে পাথরের আংটি।

বাধা দেওয়া উচিত ছিল, দিতও প্রহরী-প্রহরিণীর দল—বাদশার ঘরের দিকে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ছুটে যাওয়া, এ যে সর্বনেশে সাংঘাতিক ব্যাপার—কিন্তু পারল না তার কারণ যে হাতে তলোয়ারটা মুঠি ক'রে ধরা নেই সেই হাতেরই মধ্যমায় একটি সুবৃহৎ চতুষ্কোণ চুনির আংটি। তাতে চুনির ওপর কৌশলে খোদাই করা সোনায় লেখা কয়েকটি আরবী হরফ।

এ আংটি সবাই চেনে। এর জুড়ি আছে খোদ শাহানশার হাতে। মুহর-ই-সুলেমান।

এ অংশটি এই ব্যক্তির কাছে থাকবার কথা নয়।

কিন্তু কারণ যা-ই হোক, যার হাতে আছে তার বিন্দুমাত্র অমর্যাদা করা মানে শাহানশাকেই অপমান করা।

এর ইতিহাস একটা আছে বৈকি, এই আংটি শাহজাদীর হাতে আসার, তবে তা এদের কারও জানবার কথা নয়।

দুটি কন্যার বিবাহের সময় আলা-হজরত জিনতেরও বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন—জিনৎ রাজী হন নি, বলেছিলেন, 'না বাবা,

আমি আপনার কাছেই থাকব, আপনার সেবা করব, আপনার কাজে সাহায্য করব। আমার বিয়ে দেবেন না।'

শাহানশাহ্ বলেছিলেন, 'কিন্তু আমি যখন থাকব না মুন্নীবেটি, কে তোমাকে দেখবে? কি করবে তুমি?'

'সে অভয়মন্ত্রও তো আপনিই দিয়েছেন আব্বাজান, খোদাতায়ালার নাম জপ করে দিন কাটাব, তিনিই দেখবেন।'

সেইদিনই আদর করে এই আংটি ওঁকে দিয়েছিলেন বাদশা, বলেছিলেন, 'এ আংটি হাতে থাকলে তামাম হিন্দোস্তানে কারও সাধ্য নেই তোমার কোন অনিষ্ট করে। কাকেও কোন কারণে দেবে না এ আংটি, যদি আমার নিজের কখনও প্রয়োজন হয় আমি চেয়ে নেব।'

এ আংটি যার হাতে আছে তাকে বাধা দেবার কি তার পথ আগলাবার সাধ্য এ কিল্লায় কারও নেই।

সমস্ত রাজকার্য সেরে বিশ্রাম করতে যাওয়ার আগে প্রতিদিনই বাদশা কুরান নকল করেন। এটাকে উনি সওয়াব বা পুণ্যকর্ম বলে মনে করেন, সারাদিনে হয়ত খুদার কাছে সহস্র গোনাহ্ জমা হয়—এ কাজে সে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সেদিনও তাঁর গোপনতম রাজকর্ম সম্পাদনের কামরায় বসে বত্রিশটি বাতির ঝাড়ের তলায় কুরান নকল করছিলেন।

এই সময় বাইরে কোন শব্দ হওয়া নিষেধ, প্রহরীরা প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে পাহারা দেয়—পাছে বাদশা-সালামতের পুণ্যকর্মে বিঘ্ন ঘটে।

সুতরাং, ভেলভেটের চটি হলেও, পদশব্দ কানে গেল বৈকি।

শাহানশাহ্ ভ্রূ কুঁচকে দরওয়াজার দিকে তাকালেন।

কেউ প্রায় ছুটে আসছে এদিকে।

সাবধানী সম্রাট সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছেন চৌকি থেকে—কিন্তু তখনও কটিবদ্ধ তলোয়ারে হাত দেন নি। তা দিতে, তলোয়ার

বার করতে এক নিমেষ-পাতের বেশি সময় লাগবে না, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত, সেই কারণেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মুক্ত দ্বারপথে যে চিত্র তাঁর চোখে পড়ল তাতে এক লহমার জন্য এত বুদ্ধিমান ব্যক্তিও চমকে উঠলেন : তলোয়ারে হাত দিতে সেই এক লহমাই বিলম্ব ঘটল।

এক বুরখাপরা নারী, নারী হওয়াই স্বাভাবিক, তার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, সে তলোয়ার থেকে বোধ করি এখনও লোহু ঝরছে—বুরখাতেও তাজা লোহুর চিহ্ন।

কী সর্বনাশ, কোন সিপাহী, প্রহরী—তাঁর দেহরক্ষিণী, কেউ নেই নাকি ধারে কাছে ?

তবে ঐ এক লহমাই, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার বার হয়ে এল কোষ থেকে।

তবে অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হল না।

যে এসেছিল সেও সম্রাটকে চেনে।

ভাল করেই চেনে।

আবেগ, উত্তেজনা, প্রেম, অনুশোচনা, অন্তর্দ্বন্দ্বে সে প্রায় হুঁশ হারিয়েছিল, অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ঘোরের মধ্যে এসেছিল বলেই নিজের অবস্থার কথাটা—এবং সে অবস্থার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে—মনে পড়ে নি।

সম্রাটের দিকে চোখ পড়ে, তাঁর বিখ্যাত ভারী তলোয়ারখানা—যে তলোয়ার দিয়ে তিনি ছাড়া কেউ সহজে যুদ্ধ করতে পারে না—দেখেই সচেতন হয়েছে।

একবারমাত্র নিজের দিকে ও হাতের রক্তাক্ত তলোয়ারখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়েই সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন জিনৎউন্নিসা, বুরখাখানাও উলটে দিয়ে নিজের মুখ অনাবরিত করলেন। তারপর ছুটে এসে বাদশার পায়ের কাছে বসে পড়ে তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আব্বাজান, আমি—আমি একজনকে খুন ক'রে এসেছি।'

কোষমুক্ত অসি কোষে ফিরে যেতেও বিলম্ব হয় নি।

বাদশা-সালামত নিজের চৌকিতে বসে পড়েছেন আশ্বস্ত হয়ে। প্রবেশপথের বাইরে কৌতূহলী সেবক রক্ষকের দল অবশ্য এসে দাঁড়াবে—সেদিকে একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করতেই তারা নিমেষে অদৃশ্য হল—উনি জানেন তাদের আর সাহস হবে না ধারে-কাছেও কোথাও থাকতে। এমন ঘটনা দু-একবার ঘটেছে, বাদশা যেন অন্তর্যামীর মতো অনুমান ক'রে ত্বরিত বেগে দরজার কাছে এসে তাদের দেখেছেন এবং সেই মুহূর্তে তাদের দুই কান কেটে লাল কিলার সর্বত্র ঘুরিয়ে আনার আদেশ হয়েছে এবং তারপর তাদের সামনেই সেই কাটা কান কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে।

এরপর কৌতূহলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে এমন নির্ভীক কেউ নেই ওদের মধ্যে।

বাদশা নিশ্চিন্ত হয়েই বসে সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'মুন্নী বেটি, তোমার দিমাগ ঠিক নেই, কোন ব্যাপারে খুব বিচলিত হয়েছ বুঝছি। শান্ত হও, তারপর সব শুনব। ঐ পাশেই শরবত করা আছে, একটু খেয়ে নাও। বুরখাটা ছেড়ে আমার পাশে বসো। তার পর শুনব কি হয়েছে।' বললেন, তবে আর অপেক্ষা করলেন না, নিজেই শরবতের পাত্র হাত বাড়িয়ে নিয়ে মেয়ের হাতে দিলেন।

বাদশার হাত থেকে শরবতের পাত্র নিয়ে, সম্মান-প্রদর্শনের রীতি অনুযায়ী কপালে ঠেকালেন জিনৎ, তারপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে সবটাই পান ক'রে নিলেন।

শান্ত হলেন কিন্তু পাশে বসলেন না। কেউ নেই সামনে—তবুও। দাঁড়িয়ে থাকাই নিয়ম—তবে সে ক্ষমতাও নেই শাহ্জাদীর আর। তিনি তেমনিই হাঁটু গেড়ে বসে আব্বাজানের পা জড়িয়ে রইলেন।

বাদশা-সালামতও আর পাশে বসার কথা বললেন না, কোমল দৃষ্টিতেই—ওঁর পক্ষে যতটা কোমল সম্ভব—কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার বলো তো বেটি—কী ঘটনা, কী হয়েছিল।'

জিনৎও প্রকৃতিস্থ হয়েছেন অনেকটা। সম্রাটের সময় কম, বেশি কথা শোনার তাঁর সময় নেই। বাজে কথায় ভূমিকা ফাঁদার চেষ্টা দেখলে বিরক্ত হন। জিনৎও সোজা বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলেন, 'সব কথাই বলব আলমপনাহ্, এবং সত্য কথাই। আপনার কাছে শিক্ষা আমার—অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলি না কখনই। খোদাতায়ালাকে সাক্ষী রেখেই বলছি।'

বলতে বিলম্ব হ'ল তবুও।

সহজ নয়। এ অবস্থায় এ সব কথা বলা।

তবু বিলম্ব করাও যাবে না।

বলতেই হ'ল।

সবই বললেন, আনোয়ারের সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে, তার মুখে রৌশনআরা বেগম সাহেবার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইতিহাস, সম্ভোগপাত্রদের সংখ্যা, তাদের বন্দীদশা প্রভৃতি। তার পরেও থামলেন না। নিজের আকস্মিক প্রণয়াবেগ, আনোয়ারের পিয়ার, মাশুকের জন্য তার আত্মত্যাগ; তার মহৎ চরিত্র, তার বন্দী-দশা, ফুকীজানের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ, প্রহরীকে বধ ক'রে যন্ত্রণাগারে ঢোকা, আনোয়ারের অবস্থা, বাঁচবার কোন উপায় নেই দেখে নিজে হাতে নিজের আজিজের বুকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দেওয়া—সব।

কাহিনী শেষ হলে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বাদশার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ়—প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনার সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের হয়ে রৌশনআরা বেগমের নামে অভিযোগ জানাচ্ছি, বিচার প্রার্থনা করছি খুদাবন্দ। ঐ নটা প্রাণও যেন না নষ্ট হয়।'

বাদশা নিস্তব্ধ হয়েই শুনছিলেন, তাঁর কপিশ দুটি চক্ষুর দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ ছিল কন্যার মুখের উপর। ওঁর হৃদয়াবেগ দেখে বিচলিত হচ্ছিলেন কি কৌতুক অনুভব করছিলেন—তা বোঝার কোন উপায় নেই।

আরও কিছুক্ষণ সেই ভাবেই চেয়ে থেকে বললেন, 'অভিযোগ যখন এসেছে তখন বিচার অবশ্যই হবে মা। এ নালিশ তুমি না

এনে যদি আমার দীনতম প্রজা আনত তাহলেও সুবিচার হত। তবে—ঐ নটি প্রাণ আর বাঁচানো যাবে না, বাঁচানো সম্ভব নয়।'

শাহ্জাদী শিউরে উঠলেন, 'কেন আব্বাজান, কেন যাবে না? অতগুলি কচি তরুণ প্রাণ।'

মেয়ের শিউরে ওঠা অবশ্যই বাদশা অনুভব করেছিলেন। তবে তাতে বিচলিত হবার লোক তিনি নন। বরং ঈষৎ একটু হাসির আভাসই যেন তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। তিনি তেমনি শান্ত স্বরেই উত্তর দিলেন, 'অন্যায় যেই করুক, যতবড় অন্যায়ই করুক—তার বিচার সব সময় ন্যায় নীতি কানুনের পথে করা যায় না মা। শাহী হারেমের মর্যাদা অনেক বড়, তাকে আমি পথের ইতর লোকের পায়ে লুটিয়ে দিতে পারি না। ঐ নটি ছেলেকে চোর বলেই অভিযুক্ত করতে হবে। ভগ্নী রৌশনআরাকে বধ ক'রে বা তাঁকে বেঁধে রেখে তাঁর অর্থ ও জহরৎ নিয়ে পালাবে বলে ষড়যন্ত্র করেছিল এরা, গোপনে রক্ষীদের বশীভূত ক'রে মহলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সুযোগের অপেক্ষা করছিল—এই অভিযোগে তাদের কিলারই কাজী-ই-মুকদ্দমের [প্রধান বিচারক] কাছে পাঠানো হবে বিচারের জন্যে। এ অভিযোগ চুরিরও নয়, বস্তুত ডাকাতিরই। সুতরাং প্রাণদণ্ড ছাড়া আর কিছু যে দেবেন কাজীসাহেব তা মনে হয় না।···তবে সে শাস্তিও গোপনেই দিতে হবে—এমন সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা বেশি জানাজানি হওয়া ঠিক নয়।'

এই বলে তিনি আস্তে কন্যার হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'যাও বেটি, এবার বিশ্রাম করো। আমি লোক দিয়ে ঘুমের ওষুধ এক পুরিয়া পাঠিয়ে দিচ্ছি, গুসল সেরে সেটা খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

'কিন্তু'—কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন শাহ্জাদী। বিচারের এ দিকটা তিনি ভাবেন নি। ছেলেগুলোকে চোখে দেখেন নি তবে ভদ্র বড় ঘরের ছেলে নিশ্চয়, রূপবান তো বটেই। অকারণে পরের লালসায় ফাঁদে পড়ে প্রাণ দেবে? হয়ত বা নির্যাতনও করা হবে তাদের।

তিনি 'কিন্তু' শব্দটা উচ্চারণের বেশ খানিকটা পরে বললেন, বলতে পারলেন অনেক চেষ্টার পর, 'ওরা তো নির্দোষ বাবা, নিরপরাধ। তবু ওদের প্রাণ দিতে হবে ?'

'এ পৃথিবীতে অনেক সময় অনেককেই বিনা দোষে প্রাণ দিতে হয়। যুদ্ধ যখন বাধে তখন হাজার হাজার সেনা প্রাণ দেয়, তাদের সে যুদ্ধে লাভও নেই নুকসানও নেই। তবু তারা মরে। তা বাদে ফৌজ যখন যায়—গ্রামাঞ্চলের কত লোক নিগৃহীত হয়। মরেও কত লোক। এই দুনিয়ার নিয়ম মা। আল্লার মরজি। ইনশা আল্লাহ্।···তবে এও তোমাকে বলে দিচ্ছি, এদের খোঁজখবর নিয়ে এদের পরিবারের যতটা সম্ভব উপকার করার ব্যবস্থা করা হবে। যদি কেউ বিবাহিত থাকে তার বেওয়ার আবার শাদী দেবারও চেষ্টা করবে আমার নিজামত। সেদিকে না কোন অবিচার হয় তা দেখব বৈকি।'

'কিন্তু আসল যে অপরাধী শাহানশাহ্—তার বিচার হবে না ?'

'হবে বৈকি। তবে সকলের বিচার তো একই রকম ভাবে করা যায় না। সুবিচারই হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এই বলে, যেন মনে হ'ল হাসলেন একটু।

তবে হাসলেও সে হাসি তার কন্যার চোখে পড়ার নয়।

তারপর—শাহ্জাদী যখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন—মহলে ফিরতে উদ্যত—সহসাই যেন কী কথা মনে পড়ে গেল আলাহজরতের, বললেন, 'কাল রুম থেকে এক হেকিম এসেছিল মুন্নী বেটি, সে চিকিৎসা কি আর কতদূর করতে পারে জানি না, তবে নাকি আশ্চর্য আশ্চর্য জহর বানাতে পারে। বাল্‌খ্-এর শাহ্ আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। রাজা বাদশাদের তো এমন বিষ দেবার দরকার পড়েই—তাই লোকটা দরবারে দরবারেই ঘুরে বেড়ায়। এই যে—কাল এমনি দু-তিনটে শিশি জহর আমাকে দিয়ে গেছে, পরখ ক'রে দেখতে বলেছে। এ বিষ শরবতে কি কোন খাবারে দিলে কেউ বুঝতে পারবে না, এর কোন স্বাদও নেই গন্ধও নেই—কিন্তু

এ বিষ খাবার একদিন পরেই সারা শরীরে বিশ্রী একরকম রোগের লক্ষণ দেখা দেবে—হেকিমরা তা ধরতেই পারবে না, ইলাজ করবে কি !···একটা নিয়ে গিয়ে রাখতে পারো, যদি কোন দরকার পড়ে।'

ছোট্ট একটি স্ফটিকের শিশি, তাতে শাদা গুঁড়ো একটুখানি। সযত্নে, যেন সস্নেহেই কন্যার হাতে দিলেন বাদশা।

শাহ্জাদী কোন প্রশ্ন করলেন না, বিন্দুমাত্র বিস্ময়ও প্রকাশ করলেন না। শিশিটি সযত্নে কুর্তার জেবে রেখে নীরবে কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন সম্রাটের এই নিভৃত কর্মকক্ষ থেকে।

॥ এগার ॥

এর কিছুদিন পরে আবারও শাহ্জাদী জিনৎউন্নিসা বাদশা সালামতের দর্শনার্থী হলেন।

এবার অবশ্য এলেন এত্তেলা দিয়েই—অনুমতি নিয়ে। তবে তিনি সময় চেয়েছিলেন রাত্রে কোন এক সময়, আলা হজরতের দৈনিক কাজকার্য সমাপ্ত হলে।

সময় সেই রকমই মিলেছিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কিছু আগে।

এর ভেতর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

বিশেষ ক'রে হারেমে।

ন'টি ছোকরা নাকি শাহ্জাদী রোশনআরার মহলে ডাকাতি এবং তাঁকে বধ করার উদ্দেশ্যে এসে ঐ মহলেরই একটা ঘরে লুকিয়ে ছিল। খোজাসর্দার মেহবুবের বুদ্ধি-কৌশলে এবং ক্ষিপ্রকারিতায় তারা সকলেই ধরা পড়েছে। প্রধান কাজী সাহেবের বিচারে তাদের যথেষ্ট কায়িক নিগ্রহের পর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

তবে, পরম দয়ালু বাদশার প্রিয়তমা বেগম সাহেবা উদিপুরীমহলের অনুরোধে তাদের কায়িক নিগ্রহ বা পীড়ন মোকুফ হয়—সোজাসুজি প্রাণ দিয়েই তারা অব্যাহতি পায়।

হারেমের নৌকর মহলের গুজব—বাদশারই এক কন্যা রোশনআরা সাহেবার প্রাচীন কোন দাসীর মারফৎ এই সংবাদ পেয়ে উদিপুরী মহলের কাছে এদের হয়ে দয়া ভিক্ষা করেন—আর তার ফলেই উদিপুরী মহল বাদশার কাছে আর্জি জানান। বিচারের পর শাস্তি দানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সাহস আর কারও হত না—উদিপুরী ছাড়া।

তবে গুজব তো ওখানে অহরহই ওঠে—এই সব নৌকর-নৌকরানী মহলে—তার কতটা সত্য কতটা মিথ্যা কে জানে।

অবশ্য গুজব যেটা নয়—মীর-ই-বকাউলের মারফৎ জিনৎ মহল জেনেছেন—এই সব কটি তরুণেরই ইসলামিক রীতিমাফিক সমাধি দানের ব্যবস্থা হয়েছে। মুন্নী বেগম যাকে কুরবানি করেছিলেন সেই আনোয়ার হোসেনকেও উত্তমরূপে মাটি দেওয়া হয়েছে—বাদশা সালামতের অশেষ করুণায় তার সমাধির উপর একটি মকবারা ও তার চারিদিকে একটু উদ্যান নির্মাণেরও আদেশ হয়েছে।

তবে এ ছাড়াও খবর আছে।

এর ভিতর একটি শোকাবহ ঘটনাও ঘটে গিয়েছে।

এই ডাকাতদল ধরা পড়ার ঘটনায় রৌশনআরা বেগম সাহেবা স্বভাবতই প্রবল মানসিক আঘাত পান। কী সাংঘাতিক বিপদ হতে পারত—তাঁর অপদার্থ রক্ষীদলের অকর্মণ্যতায়, এই ভেবেই তিনি দুর্বল, শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য দু-একটি বিশ্বস্ত দাসী ছাড়া ওঁর সমস্ত সেবক ও রক্ষীকে বাদশার আদেশে কয়েদ করা হয়েছে—এবং গভীররাত্রে কোনো এক অজানা স্থানে পাঠানো হয়েছে।

বাদশার এই স্নেহ ও উদ্বেগের পরিচয়ে অবশ্যই বেগম সাহেবা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হতেন, সহসাই এক কাল ব্যাধি ধরল।

কি রোগ কেউ বুঝতে পারলেন না, কোন হেকিমই না। বাদশা ব্যস্ত হয়ে এক ফিরিঙ্গি হেকিম ডাকলেন, সেও কিছু বুঝতে পারল না। সমস্ত দেহটা ফুলে উঠতে লাগল, গায়ের চামড়া বিবর্ণ বিশ্রী হয়ে গেল, দুদিন না যেতে যেতেই, জীবিত অবস্থাতেই, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু হল, মুখখানা ফুলে এমন হল যে অমন সুন্দর আয়ত তাঁর চোখ, তাও যেন এতটুকু, নরুন-চেরা ফুটোর মতো মনে হ'তো। তহ্‌মিনার ভাষায় মুখখানা এক অপবিত্র জানোয়ারের* মুখের মতো দেখাতে লাগল।

---

*ইতালীয় ঐতিহাসিক, পর্যটক, যুদ্ধপটু, চিকিৎসক মানুচীর ভাষায় 'Swollen out like a hog's head'। এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক অংশ অনেক স্থানে মানুচীর Storia Do Mogor বই থেকে নেওয়া।

অবশ্য ঈশ্বর করুণাময়, বেশীদিন এ কষ্ট পেতেও হয়নি—অল্প-কয়েক দিনের পরেই মারা গেলেন বেগম সাহেবা।

কন্যা যখন অভিবাদন ক'রে এসে দাঁড়াল তখন সম্রাট একটু দুঃখিত বোধ করেছিলেন বৈকি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে দেখা সে জিনৎউন্নিসাকে এই মেয়েটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। শীর্ণ, শুষ্ক, বিষাদের প্রতিমূর্তি। বেশভূষার মধ্যেও তার পদমর্যাদার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। একেবারে দীনহীন না হলেও অতি সাধারণ বেশ।

শাহানশাহ্ ইঙ্গিতে তাঁকে একটা দিওয়ানে বসার ইঙ্গিত করলেন—কেউ নেই বলেই দরবারের নিয়ম লঙ্ঘন করে—কিন্তু শাহ্জাদী আজও বসলেন না বাদশার সামনে। তবে পায়ের কাছেও বসলেন না, তেমনি দাঁড়িয়েই রইলেন স্থির হয়ে। অবশ্য আর একটা শিষ্টাচার যে লঙ্ঘিত হল তা বোধ করি উনি বুঝতেও পারলেন না। বাদশার সামনে শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই নয়—মাথা নত ক'রে দাঁড়ানোই রীতি। তাঁর মুখের দিকে সোজা চেয়ে থাকায় আদবের খেলাফ্ ঘটে।

কোমল ধীরকণ্ঠে বাদশা-সালামত প্রশ্ন করলেন, 'বল কন্যা, কি বলতে চাও।'

'আলমপনাহ্, ভহ্মিনাকে কোথাও পাঠানো হয়েছে? না—নাকি তাকেও—?'

প্রশ্ন শেষ করতে পারলেন না জিনৎ, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে যেন মরীয়া হয়ে ভগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম—তার কোন ভয়ের কারণ নেই।'

কোমলতা থেকে সাধারণ অবস্থায় ফিরে এল সম্রাটের কপিশ দৃষ্টি। বললেন, 'তুমি তাকে দিয়ে যে কাজ করিয়েছ, তার পর আর তাকে সাধারণ জীবন যাপন করতে দেওয়া যায় না কন্যা, আশা করি, বাদশার পৌত্রী, বাদশার পুত্রী তুমি—এটুকু রাজনীতির কানুন

তোমাকে শেখাতে হবে না। মেয়েছেলেদের জিভ বড়ই শিথিল—তাও তোমার অজানা নেই।'

তারপর একটু থেমে আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বললেন, 'তবে তার প্রাণ যায় নি। তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে মাত্র। কোন এক কিলায় তাকে রাখা হয়েছে—নামটা নাই বা জানলে—সেখানে সে কষ্টেও নেই, পরিণত বয়সে যতটা শান্তি ও আরাম, তসল্লি ভোগ করা সম্ভব তা সে করতে পারবে, সেই রকমই আদেশ দেওয়া হয়েছে। সে এ পরিবারের পুরাতন সেবিকা—তাকে এবার আরামে অবসর যাপন করতে দেওয়াই তো উচিত। কেবল সে বাইরে আসতে পারবে না। তা ভেবে ছাখো, এখানেও তো সে প্রায় বন্দীই ছিল, এই দীর্ঘকাল। কবে সে আর বাইরের পৃথিবীতে এসেছে!'

বলে একটু কঠিন কণ্ঠেই বললেন আবার, 'বাদশা তাঁর কাজের বা বিবেচনার কৈফিয়ৎ কাউকে দেন না, কোন বাদশাই দেন নি—এত কথা বললাম তোমার অবস্থা বিবেচনা ক'রেই।'

জিনৎ এবার যখন কথা বললেন, তখন আর আবেগের চিহ্ন নেই গলায়, কেবল—যেন মনে হল তাঁর পিতার—কেমন প্রাণহীন মুখস্থ বলার মতোই শোনাচ্ছে কথাগুলো।

'আমার আর একটা আর্জি আছে আব্বা হজরৎ। আমি যদি বিবাহ করতাম—কত খরচ হত আপনার?'

এক লহমা মাত্র চুপ ক'রে থেকে বাদশা-সালামৎ বললেন, 'পাঁচ লক্ষ টাকার কম নয়।'

'আমি বিবাহ করব না—এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিয়েছি। সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কোন কারণ এ জীবনে ঘটবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেই টাকাটা কি আমি পেতে পারি?'

'অবশ্যই পারো। কিন্তু সে টাকা দিয়ে কি করবে সেটা আমার জানা প্রয়োজন।'

'আমি একটা মসজিদ তৈরী করব বাবা। ভাল বড় মসজিদ।'

'তুমি, তুমি কি ঐ ছেলেটার সমাধির ওপর মসজিদ বানাতে চাইছ। কিন্তু সে তো মকবরাই হবে।'

'না জাঁহাপনা, এত বড় স্পর্ধা আমার নেই। শুধু আপনার অসীম অনুগ্রহ, আমি শুনেছি তার সমাধির ওপর একটি মকবরা বানানোর হুকুম দিয়েছেন—যদি সম্ভব হয়, সেইখানে ওর সমাধির পাশে যদি একটু জমি দেন—মসজিদের ঘেরার মধ্যে যদি সেটা পড়ে—বহু ভক্ত বিশ্বাসী মুসলমানের পদার্পণে ওর আত্মা শান্তি পেতে পারবে।'*

'বেশ তাই হবে। টাকা আমি দেবো, তোমার ইচ্ছা মতো স্থানে ঐ টাকার মধ্যে মসজিদ তৈরি হবে। কিন্তু, তুমি—এই তোমার তরুণ বয়স, দীর্ঘ জীবন কি ক'রে কাটাবে ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি বই কি আব্বাজান। আল্লার নাম ক'রে আর আপনার সেবা ক'রে, আপনার কর্মে সহায়তা ক'রে—যদি সে অধিকার দেন—জীবন বেশ কেটে যাবে আমার। আমার সামনেই তো সাহিবাৎ উজ-জমানী জাহানারা বেগম সাহেবার মহান দৃষ্টান্ত রয়েছে আব্বাজান।'

এই শেষের কথাগুলো শুনতে শুনতে কি একবার একটু চমকে উঠলেন শাহানশাহ্—একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন? সহসা আঘাত পাওয়ার মতো চোখটা কুঁচকে গেল একটু?

কে জানে, জিনৎ অত লক্ষ্য করেন নি। তাঁর দৃষ্টি তখন যেন এই ঘরের চার দেওয়াল ভেদ ক'রে মহাশূন্যে কোন এক অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছে—কার এক স্মৃতিকে।

---

* এই মসজিদই কুমারী মসজিদ নামে পরিচিত

॥ যা চেয়েছ তার বেশী কিছু দিব ॥

আগ্রাকিলার হকিম-ই-মুকদ্দম, হকিম-ই-আলা—শাহী হকিমও কেউ কেউ বলেন, বাদশাসালামৎ শাহানশাহ্ শাজাহানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক—নূতন বে-কানুন বা জালিম বাদশার খাশ খোজা কাহিম খাঁকে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন বৈ কি।

যখন অনেকেই পশ্চিমের অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে নবীন সূর্যকে সেলাম জানাতে গিয়েছিলেন, তখন—উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বোধ হয় হকিম মুকর্‌রম খাঁই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি যান নি।

তাঁর কাছে ও তরফ থেকে কিছু গোপন দূতও এসেছিল।

শাহী হকিম যদি আগ্রা কিলা ছেড়ে দিল্লীর লাল কিলায় যান —তাঁর বর্তমান পদ-গৌরব তো থাকবেই, উপরন্তু তাঁকে কিছু জায়গীর এমন কি সম্মানজনক খান-ই-খানান উপাধি দেওয়া হবে, দুহাজারী মনসবদারের পদও।

কারণ, জালিম বাদশা আলমগীর জানতেন এই হকিম বৃদ্ধ বাদশাহ্‌র কাছে থাকলে তাঁর পরমায়ু সংক্ষেপিত করা যাবে না কিছুতেই। ইনি বৃদ্ধ বাদশার দেহের সব দুর্বলতা, তার ব্যাধি এবং সেই সঙ্গে ওঁর মানসিক ব্যাধি, উৎকট কাম তৃষ্ণার সঙ্গেও পরিচিত আছেন। শাহী হকিম বাদশার জন্যে দাওয়াই তৈরী করেন নিজ হাতে—নিজের হেপাজতে তা রাখেন, প্রয়োজন মতো নিজে গিয়ে খাওয়ান—বা বাদশাহ্‌র অধুনাতন পিয়ারের বেগম আওরঙ্গাবাদীর হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দেন, কখন কি ভাবে খাওয়াতে হবে।

নবীন বাদশার এই প্রলোভনে হকিম ই-আলা টলেন নি। শুধু তাই নয়। আলমগীর শাহ্ যখন বিজয়ীরূপে আগ্রা কিলায় এসেছিলেন তখনও শুষ্ক অভিবাদন যা শাহ্‌জাদার প্রাপ্য, শাহান শার নয়—তাই করেছিলেন। কুশল প্রশ্নের উত্তরে শিষ্টাচার সম্মত উত্তর দিয়েছিলেন মাত্র—বিগলিত ভাব দেখান নি।

রুষ্ট হওয়ার এ-ই যথেষ্ট কারণ। কিন্তু তবু নবীন বাদশা তাঁকে পদচ্যুত স্থানচ্যুত বা বন্দী করতে পারেন নি। এই হকিমের শক্তি তিনি জানতেন। ইনি কাছে থাকলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাছাড়া প্রায় সব সুবিধা ও সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন বন্দী বৃদ্ধ পিতাকে, তাঁর চিকিৎসককেও কেড়ে নিলে জগৎবাসীর কাছে তো নিন্দিত হবেনই—তাঁর নিজের সৈন্যরাই অনেকে বিরূপ হবে। তারা এখনও দরাজদিল মুক্তহস্ত বৃদ্ধ বাদশাকে ভালবাসে।

সুতরাং অন্য উপায়ে বৃদ্ধ বাদশার জীবন তিক্ত বিষাক্ত ক'রে তুললেও—যাতে বিতৃষ্ণায়, ঘৃণায় তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন—মুকর্‌রম খাঁকে আর কিছু বলেন নি।

তাই—এতকাল পরে আলমগীর বাদশার খাশ খোজাকে দেখে হকিম-ই-আলা একটু চমকেই উঠেছিলেন।

বাদশা জালিম হলেও বাদশা, এখন তো আর শাহ্‌জাহানের তখ্‌তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন পথই আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না—তাঁর আর কোন পুত্রও জীবিত নেই, তিনি নিজেই তখ্‌ৎ-এর আশা বা ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন—এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যতটুকু সম্ভোগ করা যায় তাতেই তুষ্ট আছেন। পাখী দীর্ঘকাল খাঁচায় বদ্ধ থাকলে খাঁচার দোর খুলে দিলেও পালাতে পারে না—শাহানশাহ্‌র এখন সেই অবস্থা হয়েছে।

মকর্‌রম বিস্মিত হলেও আদব ভোলেন নি। খাশ খোজাকে প্রিয়সম্ভাষণ জানাতেও ত্রুটি হয় নি। শুধু তাই নয়, কাহিম খাঁ যখন একটি মোহর-করা খৎ এবং একটি ছোট্ট কি বস্তু তাঁর প্রসারিত হাতে দিয়ে সংক্ষেপে বলে ছিলেন 'বাদশা সালামৎ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন' তখন রীতিমাফিক তা কপালে ঠেকাতেও দ্বিধা করেন নি।

বিস্ময়ের শেষও ছিল না তাঁর।

বাদশা খৎ পাঠিয়েছেন, এতদিন পরে!

কী মতলব, কী কুটিল অভিপ্রায় এবং হিংস্র উদ্দেশ্য সাধন করতে চান তিনি—ভেবে ভীতও হয়েছিলেন।

তবু খৎ খুলে আরও বিস্মিত হলেন।

এ কি চিঠি!

চিঠির শুরুতে কোন সম্ভাষণও নেই, শেষে কোন স্বাক্ষরও না।

তবে হস্তাক্ষর যে বাদশা আলমগীরের তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওঁর কাছ থেকে মুকর্‌রম খাঁ আগে একাধিক চিঠি পেয়েছেন—হাতের লেখার বৈশিষ্ট্য জানা আছে।

চিঠিতে লেখা আছে: 'এতদ্বারা শাহী হকীম মুকর্‌রম খাঁকে জানানো যাচ্ছে যে—এই পাত্রের মধ্যে যে চূর্ণ ঔষধটি আছে তা যেন হকিম সাহেব অতি-অবশ্য প্রাক্তন বাদশা শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানের খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান। নচেৎ তাঁর নিজের জীবন অবশ্য বিপন্ন হবে, তাঁর পরিবারেরও দুর্গতির সীমা থাকবে না। পরন্তু নির্দেশ ঠিক মতো পালন করলে তিনি প্রভূত উপকৃত হবেন।'

পত্র—আদেশনামা বলাই উচিত—পড়ে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন হকিম সাহেব। তার পূর্বেই মুন্সীকে বসতে ইঙ্গিত করেছিলেন, তিনিও বসেছিলেন—এবং শান্তভাবে হকিমসাহেবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। এর প্রতিটি তথ্যই ফিরে গিয়ে হজরৎ-ই-আলাকে বিবৃত করতে হবে।

সুতরাং স্থির হয়ে চিন্তা করার কোন বাধা ছিল না। তবু—সময়ক্ষেপের সীমা থাকা প্রয়োজন, বিশেষ স্বয়ং বাদশা যেখানে পত্রের উত্তর আশা করছেন। সেখানে উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়াটা প্রায় অমার্জনীয় অপরাধ।

চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন বলেই কিছুক্ষণ এসব আদবের কথা মনে পড়ে নি। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে খোজাকে বললেন, 'জাহাঁপনাকে জানাবে তাঁর আদেশ সুচারু ভাবেই পালিত হবে। হয়ত তিনি যতটা চেয়েছেন তার বেশী সেবাই পাবেন তাঁর এই নৌকরের কাছ থেকে।

ফাহিম খাঁ অভিবাদন ক'রে চলে যাওয়ার পর একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল মুকর্‌রম খাঁর মুখে। কৌতুকের হাসি। এই

শেষ কথাটা বাদশার নূতন শিরঃপীড়ার কারণ হবে সেইটে অনুমান ক'রেই।

তবে সে হাসির আয়ু এক লহমা মাত্র।

যে চিন্তায় তিনি এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলেন সে চিন্তার শেষ হয় নি এখনও।

এ চূর্ণ যে সাংঘাতিক বিষ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র ছিল না হকিম সাহেবের।

জালিম বাদশা এ সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও শান্তি পাচ্ছেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান তীক্ষ্ণদৃষ্টি আওরঙ্গজেব জানেন, দেখেছেন লক্ষ্য করেছেন, লোকের মুখের ভাব। তাদের মনের কথাও অনুমান করতে পারেন। মানুষের সংস্কার বড় প্রবল। বৃদ্ধ পিতা এবং মালিক জীবন্মৃত হয়েও যদি বেঁচে থাকেন—এ তখ্‌ৎ এ সাম্রাজ্য তাঁরই; ন্যায়ত ধর্মত। পুত্রের কোন হক বা অধিকার নেই তাঁকে কয়েদ ক'রে তখ্‌ৎ দখল করার। এঁকে একেবারে দুনিয়া থেকে সরাতে না পারলে প্রজাসাধারণ এঁর অস্তিত্ব ভুলবে না। আর কথাটা মনে থাকলে যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে পারে, গোপন ষড়যন্ত্র (উনি জানেন যে বৃদ্ধ বাদশাহ্‌কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কখনই নির্মূল হয়নি) সফল হতে পারে।

তাই তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। যতরকমে সম্ভব কষ্ট দিয়েছেন; পান ও গোসলের জল পর্যন্ত বন্ধ করতে গিয়েছেন। নিজের বিশ্বস্ত ও অনুগ্রহলোভী কর্মচারীকে না জানিয়ে বলে একটি কোন জিনিস বাইরে থেকে আনাবার অবস্থা রাখেন নি। এক পাটি জুতোর জন্যেও তারা এককালের দণ্ডমুণ্ড কর্তাকে অপমানিত করেছে।

তবু বৃদ্ধ মরেন নি, মরার চেষ্টাও করেন নি। সে ইচ্ছাও নেই। ফলে নবীন বাদশার মনে শান্তি নেই, রাজশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে উঠছে। এইবার তাই, বোধকরি মরীয়া হয়েই, চরম পথই বেছে নিয়েছেন নিষ্কণ্টক হবার।

প্রকাশ্যে ঘাতক পাঠিয়ে বধ করার সাহস এখনও পান নি—যেমন তাঁর ভাইদের করেছেন—সে জন্যেই এই সঙ্কল্প ও প্রয়াস।

পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন বাদশা আলমগীর।

আবারও ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দেয় মুকর্‌রম খাঁর, ঈষৎ যেন করুণার হাসি।

স্বার্থে পাগল হয়ে গেলে অতি বুদ্ধিমান লোকও নির্বোধের মতো কাণ্ডকারখানা ক'রে বসে। অপরকে নির্বোধ ভাবা সব থেকে বেশী নির্বুদ্ধিতা বোধ হয়। নবীন মালিককে যারা দেখেছে, তাঁর মনের গতি জানে—তারাই বলবে, কোন কুকার্যের সাক্ষী রাখেন না এ বাদশা। এই ধরনের গর্হিত কার্য যাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় তার একমাত্র পুরস্কার দেন—তাকেও এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে। ঈশ্বরের কাছে এটা অবশ্যই গোনাহ্ বলে পরিগণিত হবে কিন্তু বুদ্ধিমান বিষয়ী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে এইটাই উচিত।

মুকর্‌রম খাঁকে এত ছেলেমানুষ ভাবা উচিত হয় নি বাদশার। পুরস্কারের প্রলোভন দেখানোর আগে ভেবে দেখতে পারতেন যে যাদের দিয়ে এই ধরনের কাজ করিয়ে নেন, তাদের কিছু নিজে হাতে বধ করেন না, করতে পারেন না। সেই 'পুরস্কারও' দিতে হয় অন্য কোন লোককে বা লোকেদের দিয়ে, এবং তাদের কাছে যতই একটা কল্পিত অপরাধের কাহিনী খাড়া করুন না কেন—এইভাবে নিশ্চিহ্ন করার কারণটা তাদের বুঝতে বাকী থাকে না। অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার বা প্রকাশ্যে শাস্তি দান (বিচার যদি বাদশা-সালামৎ নিজে করেন তো অন্য বিচার লাগে না) করাই যেখানে নিয়ম, সেখানে এই অনিয়মটাই তো সন্দেহজনক। বিশেষ যদি বাদশা তাঁর বান্দাদের কাছে গায়ে পড়ে অপরাধের ফিরিস্তি দিতে যান।

অর্থাৎ একটা না হোক আর একটা কুকর্মের সাক্ষী থেকেই যায়। আর তারা একেবারে নীরব হয়ে থাকবে তাও সম্ভব নয়।

না, লুব্ধ হবারও যেমন কারণ নেই—বৃদ্ধ বাদশার জন্য অতিরিক্ত মমতাপরায়ণ হবারও না।···

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মকর্‌রম খাঁর কান মাথা এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল কেন। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। এ কিসের আগুন ?

আশ্চর্য ! এখনও ভোলেন নি, ভুলতে পারেন নি।

বহুকালের কথা হল। মকর্‌রম খাঁকে তখনও যুবক বলা যায়। ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স হবে। যে প্রবীণ হকিমের কাছ থেকে উনি ইউনানী চিকিৎসার পাঠ-নিচ্ছিলেন, তিনি বড় কড়া শিক্ষক। সামান্য কিছু দিন শিক্ষা ক'রেই বহু লোকের প্রাণনাশের—তার চেয়েও বড় কথা, রোগযন্ত্রণা ভোগের কারণ হবে—এমন লোককে তিনি শাগরেদ করতেন না। রীতিমতো কুরাণ স্পর্শ ক'রেই শপথ করিয়ে নিতেন, ওঁর অনুমতি না নিয়ে চিকিৎসা করতে পারবে না।

তাঁর কাছে পাঠ সমাপ্ত হলে তিনি ওঁকে পাঠিয়েছিলেন কাশীতে এক বিচক্ষণ কবিরাজের কাছে। সে কবিরাজের কাছেও কিছুদিন শিক্ষা করতে হয়েছিল এদেশী ভেষজে। তার পর সে ওস্তাদ হকিম দিয়েছিলেন ছাড়পত্র। তাই নিয়ে এসেছিলেন আগ্রায় শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানের দরবারে—বাদশা না হোন কোন শাহ্‌জাদার বা নিদেন কোন সুবাদার ফৌজদারের গৃহ-চিকিৎসক হতে পারেন কিনা এই আশায়।

ওস্তাদের খৎ হাতে উনি কদিনই আমদরবারে যাতায়াত করছেন। একদিন স্বয়ং উজীর-এ-আজমের হাতে সে খৎ দেবার সৌভাগ্যও হয়েছিল। তিনি রোকার মর্মার্থ বাদশাকে শুনিয়েও ছিলেন। বাদশা ঘাড় নেড়েছিলেন, অর্থাৎ বুঝলেন কথাটা। এই মাত্র। আর কোন হুকুম দেন নি। বিশেষ কোন বিবেচনা করছেন তাও মনে হয় নি ওঁর ভাব দেখে। যা সামান্য সম্বল নিয়ে এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে, তাও ক্ষীয়মান—ফিরে গিয়ে কোন গ্রামে বসবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় এক অঘটন ঘটল।

অকস্মাৎই এক সভাসদ পেটের তীব্র যন্ত্রণায় বেঁকে পড়ে চিৎকার করতে লাগলেন।

বাদশার অপ্রীতি বা বিরক্তির কারণ হবে ভেবে সিপাহীরা ও অন্য সভাসদরা কেউ কেউ তাঁকে সেখান থেকে সরাবার চেষ্টা করতে যাবেন—স্বয়ং বাদশা ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। তারপর পিছনে অপেক্ষমান করুণাপ্রার্থীদের দিকে চেয়ে এক সিপাহীকে ডেকে ভিড়ের মধ্যেই মকর্‌রম খাঁকে দেখিয়ে তাঁকে ডাকতে বললেন। বোধ হয় এই শ্রেণীর কোন সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন মকর্‌রম—তিনি সাগ্রহে, ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই এগিয়ে এলেন।

তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হলেন বাদশা। মকর্‌রম খাঁ যে ভয় পান নি, সংকোচ বোধ করেন নি, এতেই বুঝলেন ছোকরার আত্মবিশ্বাস প্রচুর। কাছে আসতে বললেন, 'তুমি কেমন শিখেছ ওস্তাদের কাছ থেকে, তার একটু পরিচয় দাও। ওসমান খাঁকে ছাখো—ওর কি হয়েছে '

'আমার যথাসাধ্য করব আলমপনা। তবে খুব কঠিন কিছু নয় অসুখটা—আমার যা মনে হচ্ছে।'

তিনি এগিয়ে এসে নাড়ী দেখলেন। তারপর একজনকে কি বললেন, সে একটা কড়াইয়ের মতো জিনিস আর এক কলসী জল নিয়ে এল। একবার বাদশার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন মকর্‌রম, কারণ পৃথ্বীশ্বরের সামনে দেহের কোন অংশ অনাবৃত করা অসভ্যতা। দূর থেকেই দেখতে পেলেন বাদশা হকিমের মুখের বিপন্নভাব, বুদ্ধিমান শাহানশার কারণটাও বুঝতে বিলম্ব হল না। তিনি হকিমকে ইঙ্গিতে অভয় দিলেন। তখন ওসমান খাঁর পেটটা অনাবৃত ক'রে কড়াইটা তার উপর বসিয়ে একজন ধরে রইল। আর একজন কলসীটা উঁচু ক'রে তাতে অল্প অল্প জল ঢালতে লাগল। কড়াই ভরে গেলে জল ফেলে আবারও কড়াই ধরা হতে লাগল। ইতিমধ্যে হকিমসাহেবও তাঁর জোব্বার জেব থেকে একটা কি বড়ি বার ক'রে গুঁড়িয়ে ওসমানের জিভে লাগিয়ে দিলেন।

বাদশা এবং সভাসদরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন তবে বেশীক্ষণ লাগল না। একদণ্ড সময়ের মধ্যেই ওসমানের মুখ থেকে

যন্ত্রণা ভোগের চিহ্ন চ'লে গেল। শুধু ক্লান্তিটা লেগে রইল। মুকর্‌রম খাঁ জল কড়াই সব সরিয়ে দিতে বলে আস্তে আস্তে আবার পোশাক এঁটে দিয়ে ওসমান খাঁকে ধরে বসিয়ে দিলেন। ওসমান একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমিনত হয়ে অস্ফুট কণ্ঠে এই গুস্তাকির জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন বাদশার কাছে।

শাহ্‌জাহান কোমল স-প্রশ্রয় কণ্ঠে বললেন, 'না না ওসমান খাঁ, আপনি লজ্জা পাবেন না। বিমারী জীবমাত্রেরই হয়। আপনি বাড়ি ফিরে যান—বৈকালে হকিমসাহেব গিয়ে আপনাকে দেখে আসবেন আর একবার।'

তারপর উজীর-এ-আজমকে বললেন, 'এই—কী যেন নাম হকিমের?—মকর্‌রম খাঁ—এঁকে আমরা কিলার একজন হকিম নিযুক্ত করলুম, তন্‌খা পরে ঠিক ক'রে দেবেন আপনি। আপাতত আজকের জন্যে দশ আশরফি দিন। আর কিলার মধ্যে ওঁর বাসস্থানেরও একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। দাওয়াই বানাবার জন্যে কজন লোক লাগবে জেনে নেবেন, তাছাড়া নৌকর দেবেন একজন।

ঈর্ষায়—এমন কি উজির সাহেবেরও—অকারণেই মুখ কালো হয়ে গেল।

প্রয়োজন ছিল না। বায়ুর প্রকোপজনিত ব্যথা। বায়ুশূল। তবু বাদশার হুকুম—অপরাহ্ণে প্রথম রোগী দেখতে যাত্রা করলেন মকর্‌রম খাঁ। এক প্রহরের মধ্যেই তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, নৌকরও। অন্য যা সহকারী লাগবে তা তিনি নিজে নির্বাচন করবেন। যান বা বাহনের ব্যবস্থাও হয়েছে। পালকী না ঘোড়া কি নেবেন প্রশ্ন করা হয়েছিল—উনি ঘোড়াই পছন্দ করেছেন। ঘোড়ায় চেপেই গেলেন ওসমান খাঁর বাড়ি।

ওসমান খাঁ নিজেই সসম্মানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন। রুমালের ওপর পাঁচ মোহর নজরানাও ধরলেন সামনে। হকিম সাহেবও নাড়ি দেখে পথ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে উঠতে যাবেন—

ওসমান খাঁ হকিম সাহেবকে জানালেন তাঁর একটি কন্যার কিছুদিন ধরেই তবিয়ৎ ঠিক যাচ্ছে না। হকিমসাহেব কি অনুগ্রহ ক'রে একবার তাকে দেখবেন ? মেয়ে এখনও অনূঢ়া—তবে উনি চিকিৎসক, ওঁর কাছে লজ্জার কোন কারণ নেই। আবরুর প্রশ্নও ওঠে না।

অগত্যা বসতে হল হকিমসাহেবকে।

কিন্তু রোগিনী যখন তাঁর সামনে এল—মকরুম খাঁর মনে হল তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। বারো তেরো বছর বয়স হবে—যৌবন এখনও ঠিক দেখা দেয় নি—তবু হকিম মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—এমন সুন্দরী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নি।

বিমারী এমন কিছু নয়—নারীধর্ম প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে, অর্থাৎ এখনও ঋতুমতী হয় নি। ওস্তাদজীর কৃপায় এবং কাশীর কবিরাজের লক্ষণ-নির্ণয় শিক্ষায় এসব উনি দেখলেই ধরতে পারেন। সেই কথাই প্রশ্ন করলেন ওসমানকে—'এখনও মাসিক ব্যাপারটা শুরু হয় নি, না!'

ওসমান তো অবাক। বললেন, 'দেখেই বলে দিলেন। তাজ্জব। ধন্য আপনার শিক্ষা। ঠিকই তাই। কিন্তু সেই জন্যেই কি—?'

'হ্যাঁ, সেই জন্যই। আহারে অরুচি, বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, মধ্যে মধ্যে কোমরে যন্ত্রণা, এই সব তো ? ঠিক হয়ে যাবে। আমি দাওয়াই পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর এই গাছড়াগুলো আনিয়ে নেবেন চৌক বাজার থেকে, রস ক'রে গরম দুধের সঙ্গে খাওয়াবেন।'

ওসমান কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বহুৎ বহুৎ 'সোকর-গুজারি' করলেন। বড় মেয়েটিকেও এনে দেখালেন। এক বছরের বড় কিন্তু তার এসব মিটে গেছে অনেকদিনই। তার স্বাস্থ্যও ভাল। তার নাম রাবেয়া, ছোটটি লায়লা*। হয়ত রাবেয়াই বেশী সুন্দরী —কিন্তু লায়লাই প্রথম ওঁর চোখে পড়েছে। সেই ছবিই মর্মে গাঁথা হয়ে আছে। আয়ত চোখের কোলে ঈষৎ কালিমা। দৃষ্টিতে

---

* ইতিহাসে এদের নাম আছে আফ্‌তাব ও মহ্‌তাব।

করুণ ভাব একটা, ক্লান্তির চিহ্ন শুষ্ক মুখে—ওঁর মনে প্রচণ্ড তুফানের সৃষ্টি করেছে এক নিমেষে।

হকিম বললেন, 'আপনি ভালই আছেন, তবে বাদশার হুকুম আমাকে আরও দুএকদিন আসতে হবে—কিন্তু আর কোন নজরানা দেবেন না দয়া ক'রে. নিতে পারব না।' হয়ত বাদশার হুকুমটা মিথ্যা—তবে বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা বললে গোনাহ্ হয় না।

এই ছুতোয় মেয়েটিকে আর দু একবার দেখার সুযোগ হবে।

তবে যে রোগী নয়—তাকে দেখতে যাবার অজুহাত আর কদিন ভাববেন? একসময় যাওয়া বন্ধ করতে হল। কিন্তু মনটা পড়ে রইল ঐখানেই।

তারপর অবশ্য আবেগের সে তীব্রতা কমে গেল।

বাদশা-সালামতের অনুগ্রহে তাঁর উন্নতি হতে লাগল দ্রুত। রোগীর সংখ্যা বাড়ল। শুধু কিলার মধ্যেই নয়—বড় বড় রাজপুরুষদের বাড়িও ডাক পড়তে লাগল। সরকারের দেয় তন্‌খা তো আছেই—সেও বাদশার অনুগ্রহে লাফে লাফে বাড়ছে। অন্যদের বাড়ি রোগী দেখতে গেলে প্রথম নজরানা—সেও কম নয়।

শাদী আগেই করা ছিল, কাশ্মীরের এক গ্রামে থাকতেন তাঁরা—এখন পৃথক গৃহ পেয়ে তারাও এসে গেল—পুত্রকন্যাদের দায়িত্বও চাপল। এক-একদিন নিশ্বাস ফেলার সময় পান না হকিমসাহেব।

তারপর এই ঝড় উঠল। শাহানশাহ্ শাহ্জাহাঁ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দারা শুকো অকস্মাৎ হকিমের চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছুদিন ফকীর দরবেশদের ডেকে প্রার্থনার ব্যবস্থা করলেন, তার ফলে রোগ বৃদ্ধি পেল বাদশার—বাইরেও ওঁর এন্তেকালের জনশ্রুতি প্রবল হল।

তারপর অবশ্য বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন বাদশা জোর ক'রেই ওঁকে ডাকালেন। চিকিৎসাও হল। কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে ওঠার আগেই ভ্রাতৃযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শেষে যখন বাদশা আগ্রা দুর্গে

আবদ্ধ হলেন তখন বেগমসাহেবা জাহানআরার সঙ্গে আর একজন মাত্র যিনি স্বেচ্ছায় বন্দী হলেন বাদশার সেবার জন্য—তিনি হকিম মীর মকর্‌রম খাঁ। জালিম* বাদশার বহু প্রলোভনেও তিনি অস্তগামী সূর্যকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না।

এখানেই আকস্মিকভাবে আবার লায়লা তাঁর জীবনে এসে গেল। সম্রাট-মহিষীদের কিছু বালক পিশখিদমৎ (বা 'পেজবয়') থাকতে পারে—কিন্তু সে নিতান্তই বাইরের ফায়ফরমাশ খাটার জন্য। অন্তরঙ্গ সেবা বা সাহচর্যের জন্য সহচরী থাকত কিছু কিছু। সব দেশেরই রাজতন্ত্রে এ নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাদের মধ্য থেকে এদের নির্বাচন করা হত। দাসী হলেও এ পদ গৌরবের মনে হত।

এখানে আওরঙ্গাবাদী মহলের সহচরী হিসেবেই লায়লা আর রাবেয়া এসেছে। পূর্ণ যুবতী তারা এখন। আরও, আরও দেখতে সুন্দর হয়েছে। চোখ ধেঁধে যায়—তাদের দিকে চাইলে। চিকিৎসক হিসেবে এখন অন্তঃপুরেও হকিমের অবারিত দ্বার। সেই প্রয়োজনেই যেতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে যে তাঁর এতদিনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবেন তা কল্পনাও করতে পারেন নি। দুজনেই অপূর্ব সুন্দরী—কিন্তু এখনও, মকর্‌রম খাঁ দেখলেন, লায়লার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত বেশী। অপেক্ষাকৃত শীর্ণ, দৃষ্টিতে ক্লান্তির ছায়া, সবটা জড়িয়ে কোমল লতার মতোই মনে হয়—যেন কোন সহকারের আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে, পেলে তাকে আলিঙ্গন ক'রে সুখী ও নিশ্চিন্ত হতে পারে।

বিস্ময়ের এই—কিছুদিন নানা ছুতায় আওরঙ্গাবাদীর মহলে যাতায়াত ক'রে ঈষৎ ঘনিষ্ঠতা হতে হকিম বুঝলেন—লায়লার মনোভাবও অনুকূল। সেও নাকি সেই প্রথম দিন থেকে হকিমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। আশ্চর্য! হকিম সাহেব ঠিক প্রৌঢ় না হলেও কোনমতেই তাঁকে যুবকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তিনি

* জোর করে যে অনধিকারী সিংহাসন বা রাজ্য দখল করে।

বিবাহিত, দুটি সন্তান আছে তাও জানে লায়লা—তবু তার এ আকর্ষণ কেন ?

এ বুঝি ঈশ্বরেরই করুণা।

উনি আগ্রা দুর্গে এলেও স্ত্রীপুত্র আসে নি। তারা দিল্লীতেই আছে। নবীন বাদশার চোখ তাদের উপর পড়তে পারে। তাদের ওপর জুলুম চালিয়ে ওঁকে দুর্বল করার সুযোগ কি এ বাদশা ছেড়ে দেবেন ? এই কথা ভেবেই উনি তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন—টাকা-পয়সা দিয়ে। একরকম আত্মগোপন ক'রেই আছে তারা। সুতরাং এখানে একা উনি। ক্রমশ, দুচার দিন যেতে লায়লাও আসতে লাগল ওঁর কাছে। এখানে এই বিপর্যয়ের মধ্যে হারেমের পাহারা অত কড়া নয়। যে সব তাতারিনীরা আছে —তারা বৃদ্ধ বাদশার ওপর নজর রাখতেই ব্যস্ত, সহচরীদের দিকে চোখ রাখা কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

এইভাবে, প্রণয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, লায়লাই প্রস্তাব করেছে শাদীর—তখন বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল।

সে বজ্র হকিমসাহেবের কলিজাকে ঝলসিয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার ক'রে দিয়ে গেল।

বৃদ্ধ বাদশা দৈবাৎ ঐ দুটি মেয়েকে দেখে মোহগ্রস্ত হয়েছেন কবে শেষে লালসায় অস্থির হয়ে সেই ঈপ্সার কথাটা জানিয়েছেন প্রিয়তমা পত্নীকে, লাজ-লজ্জা পরিত্যাগ ক'রেই। পতিব্রতা আওরঙ্গাবাদীও তরুণী দুটিকে স্বামী এবং মালিক-ই-জাহানের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর খুঁজে পান নি।

দুটি বোনই এখন বৃদ্ধ সম্রাটের ভোগ্যা—আর সে পথ সহজ ক'রে দেবার দাওয়াই মকররম খাঁকেই যোগাতে হচ্ছে।

স্থির হয়েই বসেছিলেন মকররম খাঁ—এখন এই ক্ষতিটা,

দুটো জীবন মরুভূমি হয়ে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে—ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

বেশ হয়। এখনও সময় আছে। ঐ কামার্ত বৃদ্ধ অপসারিত হলে তাঁর দুরকম লাভ। প্রিয়তমা করতলগত হয়, হতে পারে। পুরস্কারও পাবেন প্রচুর। অবশ্যই নবীন বাদশার পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না, তা তাঁর প্রয়োজনও নেই। তিনি সেই রাজ-মৃত্যুর গোলমালের মধ্যে তাঁর প্রিয়তমাকে নিয়ে পালাতে পারবেন অনায়াসে। হাতে অর্থ আছে, বিশ্বস্ত শিষ্য আছে—কোন শস্যবাহী নৌকায় আত্মগোপন ক'রে বহুদূরে, সুদূর পূর্ব বা দক্ষিণ দেশের কোন ছোট শহরে বা বড় গণ্ডগ্রামে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন।

বেশী যশখ্যাতি, অনেক অর্থে প্রয়োজন নেই—দুজনে দুজনকে নিয়ে কুটিরে বাস করলে বেশী খুশী হবেন।

লোভে,—কামনা বা প্রেম চরিতার্থ করতে পারার সম্ভাবনায় —উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ঘেমে উঠলেন, অস্থির হয়ে পড়লেন।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে একটা মূল্যবান তথ্যও।

নবীন বাদশার বিরাগভাজন হয়ে এখানে এসেছেন কেন? পড়েই বা আছেন কেন? কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতেই তো? মনে পড়ে গেল সেই প্রথম দিনটির কথা—সম্রাটের সেই বিপুল প্রশ্রয়। বিনা কারণে তাঁকে সেই জনসমাজের মধ্য থেকে ডেকে নিয়ে নিজের নৈপুণ্য ও শিক্ষা দেখাবার সুযোগ দেওয়া। তারপর অবিরাম স্নেহ বর্ষণ—অর্থ ও সম্মানের পথ অবারিত ক'রে দেওয়া, বন্যা বইয়ে দেওয়া। তাঁর কোন সুপারিশ ছিল না, ছিল না পরিচয়ের কোন সূত্র। যে বলতে গেলে পথের ভিখারীকে ডেকে রাজরাজেশ্বরের আসনে বসিয়েছে—তাকে হত্যা করবেন! সর্বোপরি যে লোকটা ওঁকে বিশ্বাস করে! নির্বিচারে ওঁর হাত থেকে ঔষধের পাত্র গ্রহণ করে!

সেই লোককে সেই ঔষধের পাত্রে বিষ মিশিয়ে দেবেন! ধিক!

তাকে হত্যা করবেন নিজের লালসা রিরংসা চরিতার্থ করতে।

প্রেম? তার মূলে তো দৈহিক কামনাই। তাহলে আর বাদশার দোষ দেখবেন কোন স্পর্ধায়? যে বৃদ্ধ মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে তার তো ইহকালের সম্ভোগকে আঁকড়ে ধরাই স্বাভাবিক।

আবারও সেই অস্থিরতা। তবে অন্য কারণে এবার। অপরাধ বোধের লজ্জায়।

হতাশ হয়ে—কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগের প্রায়-অস্ফুট কাতরোক্তি ক'রে—আবারও বসে পড়লেন মকর্‌রম খাঁ। তারপর জোব্বার আস্তিনে ললাটের ঘাম মুছে আস্তে আস্তে সেই স্ফটিকের শিশির দিকে হাত বাড়ালেন। আঙুরের রস পাশেই ছিল, বাদশার জন্য উত্তেজক ঔষধ বানাতে যাচ্ছিলেন তিনি, তাতেই চূর্ণটা ফেলে একটু নেড়ে নিয়ে সবটা পান ক'রে ফেললেন।

লোভ বড় প্রবল। বিশ্বাস নেই নিজেকে। বিলম্ব করা বিপজ্জনক।

আঃ, পিপাসারও শান্তি হল—বিবেকের যুদ্ধও শেষ।

শ্রান্তি ও শান্তিতে চোখ বুজলেন হকিম সাহেব। দেখতে দেখতে গভীর নিদ্রা নেমে এল তাঁর চোখে, আচ্ছন্নতা তাঁর মস্তিষ্কে।

সে নিদ্রা আর ভাঙল না।

ভাঙবে না হকিম সাহেবও তা জানতেন।